# NK Roy Professional Corporation

## Chartered Professional Accountant

CPA CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS CANADA

CGA CERTIFIED GENERAL ACCOUNTANT

**Nupur Kumar Roy**

**CPA,CGA**

## OUR PROFESSIONAL SERVICES

- Compilation engagement (Notice to Reader)
- Assistance in preparing audit working paper files
- Income Tax (Efile)/Tax planning
- Representing CRA audit/Tax appeal
- Controllership/Full cycle Accounting
- Bookkeeping/GST/HST
- Payroll including WSIB/EHT
- Business incorporation/Registration
- Business plan: Small Business Loan
- Accounting system design & software set up

3000 Danforth Ave., Unit # 3, Suite # 111, Toronto, ON M4C 1M7

Office: 416-479-9495 Cell: 416-670-0444 Email: info@nupurkumarroy.com

**www.nupurkumarroy.com**

# Markington FamilyCare & Walk In Clinic

## Family Practice & WALK-IN

Eglinton & Markham

**416-261-4446**

Dr. Laila Afroz (Neela)
Family Physician MD, MCFP

Call to Register or WALK IN

Dr. A S M Noorullah Tarun
Family Physician MD, CCFP

## Dr. Shubarna Amin
**MD. FRCPC**
Internal Medicine Specialist

**Hour of Operation**
7 days in a week
*Effective from July, 2017*

M-F 9am to 8pm
Sat 9am to 4pm
Sun 10am to 2pm

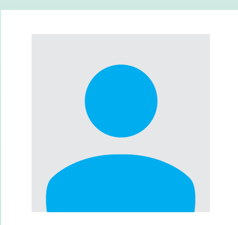

## Dr. Sharmi Shafi
**MD. FRCPC**
**EMG Board Certified, Neurology & Neuromuscular specialist**

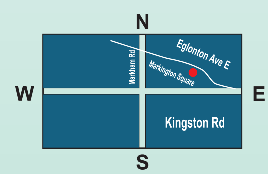


**Markington Square**
3227 Eglinton Ave. East
Unit-143-144
Scarborough, M1J 3M5

***Cardiac Diagnostic & Consultation***

***Female Gynecologist consulting regularly***

**Kanan Barua**
M. Pharm, R.Ph.
Patient Impact Award Winner Pharmacist
Ontario Pharmacusts Association (OPA)
pharmacistkanan@gmail.com

- Free Prescription Pick Up & Delivery
- Accept All Public & Private Drug Insurance
- Waive $2.00 for all Drug Plans
- 15% Senior Discount On All Thursdays
- We Speak Bengali, English, Hindi & Urdu
- Free Blood Pressure & Diabetes Check

ফার্মাসিস্ট কানন বড়ুয়ার নতুন ফার্মেসী

KANAN'S Guardian™ PHARMACY

**416-264-1110**

বাড়ি কেনা
কোন দুঃস্বপ্ন নয়,
বাড়ির স্বপ্ন
বাস্তবায়নে
আমি আছি
আপনার পাশে!!
শারদীয়
দুর্গোৎসব
Let me help
you find your
dream home
RE/MAX
RE/MAX®
TO BUY & SELL REAL ESTATE
REALTOR
MLS
MULTIPLE LISTING SERVICE
Independently owned and operated under Remax
All-Stars Realty inc., Brokerage
2281 Kingston Road, Toronto, Ontario, M1N1T8
Bus: (416)265-2000 Fax (416)265-8210
E-mail: chitta.realtor@gmail.com
Chitta Das
Sales Representative
Direct: 416-655-0996

BANGLADESH-CANADA
HINDU CULTURAL SOCIETY
TORONTO
GAP

স্বপ্নের বাড়ীর জন্য আর অপেক্ষা নয় ...
স্বর্গীয় সুব্রত সোমের ভাই
মিঠু সোম
এখন আপনাদের সেবায়
For Buy, Sell or
Lease Properties
Please call:
Mithu Shome
SALES REPRESENTATIVE
GOLD CIRCLE AWARD 2017 WINNER
416.846.6815
mitoshome@yahoo.ca
MULTIPLE LISTING SERVICE
PUBLIC CHOICE
REALTY
Public Choice Realty Inc. Brokerage
#88-7393 Markham Road
Markham, ON L3S OB5
Office: 905-471-1181, Fax: 905-471-1187

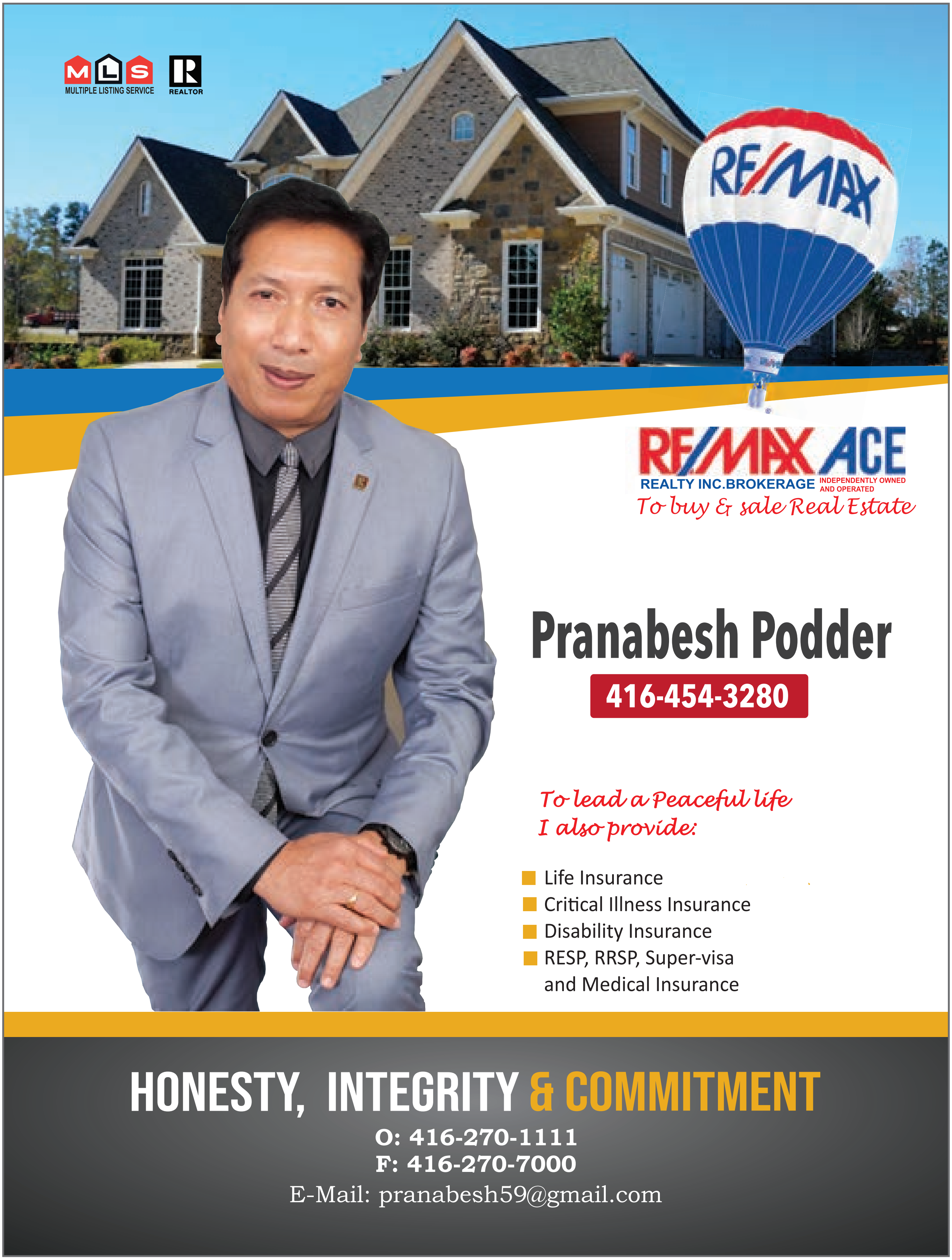
MLS
MULTIPLE LISTING SERVICE
REALTOR
RE/MAX
RE/MAX ACE
REALTY INC.BROKERAGE
INDEPENDENTLY OWNED AND OPERATED
To buy & sale Real Estate
Pranabesh Podder
416-454-3280
To lead a Peaceful life
I also provide:
Life Insurance
Critical Illness Insurance
Disability Insurance
RESP, RRSP, Super-visa
and Medical Insurance
HONESTY, INTEGRITY & COMMITMENT
O: 416-270-1111
F: 416-270-7000
E-Mail: pranabesh59@gmail.com

# ARE YOU PLANNING TO BUY/SELL

# Real Estate

## Service you deserve persons you trust

Free Evaluation

HOMELIFE
HIGHER STANDARDS

**Goutam Majumder**
Sales Representative
**647-200-6659** (Dir)
E-mail: sougota2002@yahoo.com
gmajtor@gmail.com

**HomeLife/Future Realty Inc.**
**205-7 Eastvale Dr. Markham, ON**
**Independently Owned & Operated**
**Bus: 905-201-9977**
**Fax: 905-201-9229**

# LAW OFFICE

"You are the Purpose,
Part and the Opportunity of our Work"

## PRACTICE AREAS

Real Estate
Litigation
Family Law
Immigration
Wills & Power of Attorney

Legal Aid Accepted

**We speak English,
Bengali, Hindi & Urdu**

# JAYANTA K. SINGHA

Barrister & Solicitor, Notary Public

**2436 Kingston Road, Scarborough, ON M1N 1V3
Tel: (416) 265 9449 Fax:(416) 265 4044
Cell: (647) 771 0032
Email: info@singhalaw.ca www.singhalaw.ca**

আপনি কি প্রতারিত হচ্ছেন?
বাড়ী বানানো নিয়ে প্রতারিত হচ্ছেন?
বাজেটের থেকে বেশী টাকা চার্জ করা হচ্ছে?
ডিজাইনটি কি মনের মত হচ্ছে না?
তা হলে আসুন আমাদের কাছে,
স্বল্প মূল্যে আপনার স্বপ্নের বাড়ী
তৈরী করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ
GUARANTEE
We arrange Financing
Custom Home Builder
কানাডাতে বাড়ী বানানোর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
Shan De
Custom Home Inc.
3000 Danforth Ave., Room # 103
Toronto, ON M4C 1M7
customhometoronto@gmail.com
Shankardey7@gmail.com
Tel : 416.910.8753 (Cell)
: 647.347.2310 (off)
www.customhomecanada.com

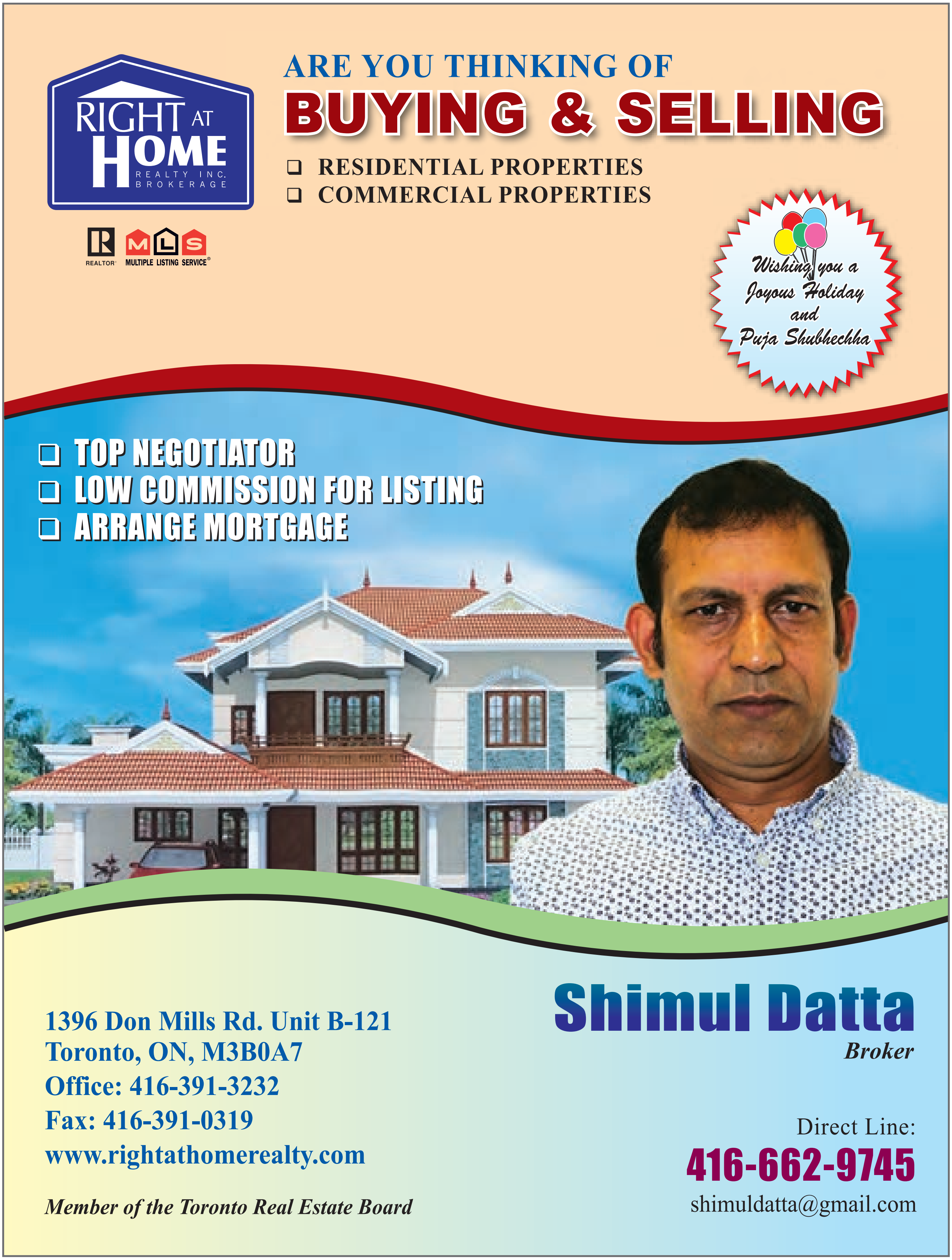
RIGHT AT HOME
REALTY INC.
BROKERAGE
REALTOR
MLS
MULTIPLE LISTING SERVICE
ARE YOU THINKING OF
BUYING & SELLING
❑ RESIDENTIAL PROPERTIES
❑ COMMERCIAL PROPERTIES
Wishing you a Joyous Holiday and Puja Shubhechha
❑ TOP NEGOTIATOR
❑ LOW COMMISSION FOR LISTING
❑ ARRANGE MORTGAGE
1396 Don Mills Rd. Unit B-121
Toronto, ON, M3B0A7
Office: 416-391-3232
Fax: 416-391-0319
www.rightathomerealty.com
Member of the Toronto Real Estate Board
Shimul Datta
Broker
Direct Line:
416-662-9745
shimuldatta@gmail.com

# ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কোনও আগাম সংকেত দেয় কি?

সফিউন্নিসা ও পুলক শাণ্ডিল্য

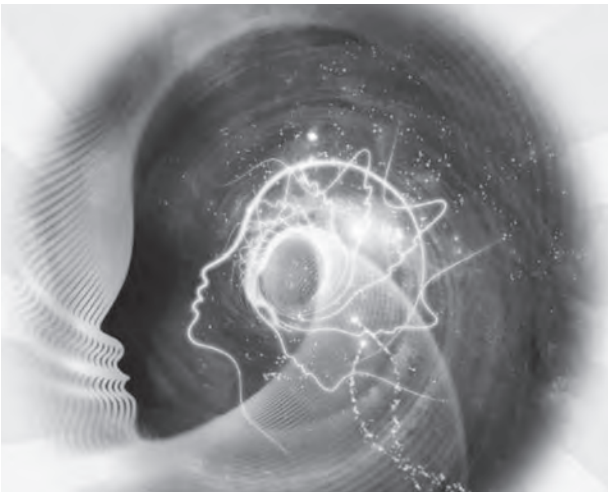

*সিক্সথ সেন্স ব্যাপারটা আদতে কী? আমরা তো পঞ্চইন্দ্রিয়ের কথা জানি। পাঁচরকম অনুভূতির বাহক তারা। তাহলে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ব্যাপারটা কেনম, তার অস্তিত্বই বা কোথায়, সেটি কি সত্যিই সবার মধ্যে থাকে? –কে যেন চলে গেলো সামনে দিয়ে, কেউ যেন তাকিয়ে রয়েছে এসব বোধ যে নিছক মিথ্যা বা ভুল এমনটা বলা যায় না। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে জানি যে এটা হতে পারে, কীভাবে হতে পারে তার কিছু ব্যাখ্যাও রয়েছে। পাশাপাশি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো সত্যিই সিক্সথ সেন্স বলে কিছু আছে। বিজ্ঞানীরা একে বলছেন প্রো-প্রায়োসেপশান। সাধারণত সবাই বলে, মেয়েদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা সিক্সথ সেন্স খুব প্রখর হয়। কী বলেন বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. দেবাঞ্জন পান। মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলে লিখেছেন **সফিউন্নিসা**। এছাড়াও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কীভাবে মানুষকে বিপদ থেকে রক্ষা করে সেই বিষয়ে আলোকপাত করেছেন **পুলক শাণ্ডিল্য**।*

## ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আমাদের কি কিছু জানান দেয়?

সফিউন্নিসা

বাংলা সাহিত্যের একজন প্রকৃতিপাগল লেখক জীবনের শেষ পর্বে দেখতে পেয়েছিলেন একাকী এক পাহাড়ি পথে নিজেরই মৃতদেহ। বলেছিলেন তাঁর যাওয়ার দিন প্রায় সমাগত। ঘটেওছিল তাই।

আমাদের চেনা-জানার গণ্ডিতে এমন দু'একজন মানুষের কথা জানা যায় যাঁদের ভূয়োদর্শী বলে চিহ্নিত করেন সকলে। এঁরা আগাম ভবিষ্যতের সম্ভাবনা যা জানিয়ে দেন, তার কিছু না কিছু মিলে যায়।

**আমরা পাঁচটি সেন্সের কথা জানি। কিন্তু এর বাইরেও ষষ্ঠ সেন্স আছে। বিজ্ঞানীরা একে বলছেন প্রো-প্রায়োসেপশান। এটা একটি ফাংশান। এটা যদি ঠিকঠাক থাকে তবে একজন মানুষ তার পজিশনটা বুঝতে পারে। তার শরীর কোথায় রয়েছে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাত, পা, মুখ, মাথার অবস্থান কোথায় সে বিষয়ে সে ওয়াকিবহাল থাকে।**

পরিচিত বৃত্তে প্রায়ই শোনা যায়, নতুন জায়গায় বেড়াতে গিয়ে এক-একটা এলাকা যেন খুব চেনা লাগলো। মনে হলো এর আগেও অনেকবার এসেছি। এই পথগুলি ধরে হেঁটে গিয়েছি কতবার। কিংবা প্রিয় বন্ধুর ফোনটা রিসিভ করে বিস্মিত হই– আজ সকালেই তো তার কথা ভাবছিলাম অনেকক্ষণ ধরে। মায়ের অসুস্থতার খবর সকালে পেয়েই কন্যার প্রতিক্রিয়া– মা যে অসুস্থ হবেন আমার মন বলছিলো, পর পর দু'দিন স্বপ্ন দেখলাম মাকে, মা পথ হারিয়ে ফেলে কোথায় কোথায় ঘুরছেন, গতকাল রাতে দেখলাম মা খুব কাঁদছেন। তখনই ভেবেছি মায়ের কিছু ঘটবে।

ছুটিতে দিন কয়েকের জন্য দিদির বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছে ছোট ভাইটি। দ্বিতীয় দিন সারারাত ঘুম এলো না– অদ্ভুত এক অশান্তি মনের ভেতর। ভোর না হতেই সবার বাধা অগ্রাহ্য করে ব্যাগ কাঁধে বেরিয়ে পড়লো সে। স্টেশনে এসে হতাশ– কোথাও রেল অবরোধের জন্য ট্রেন চলাচল বন্ধ। মনের উচাটনভাব আরো বেড়ে গেলো। একটি মুড়ির বস্তা ভর্তি গাড়িতে টাকার টোপ দিয়ে চেপে বসলো সে। বাড়ি পৌঁছে হতবাক– কিছুক্ষণ আগেই ম্যাসিভ হার্ট এ্যাটাকে মারা গেছেন বাবা। কান্নার রোল চারিদিকে। তাকে দেখে অনেকের মন্তব্য– একটা মাত্র পুত্রসন্তানকে বাবা প্রাণের চাইতেও ভালোবাসতেন– তাই তিনিই টেনে এনেছেন।

মৃত্যুশয্যায় এক মা। সন্তানরা বিমর্ষ। প্রবল জ্বরে প্রায় বেহুঁশ মা জ্ঞান ফিরতেই বলছেন কেউ কাঁদিস না, আমায় যেতে দে। আমি মায়ার বাঁধন কেটে দিয়েছি। রাত দু'টোয় সব শেষ। দূরে থাকা দুই কন্যার একজন রাত দেড়টায় আচমকা ঘুম ভেঙে গিয়ে দেখলো মা দাঁড়িয়ে রয়েছেন মশারির বাইরে। আর একজন রাত বারোটায় ঘুমাতে যাওয়ার সময় অনুভব করলো তীব্র এক অচেনা সুবাসে ভরে গেছে ঘর।

প্রায় প্রতিটি মানুষ জীবনের কোনো না কোনো পর্বে কিছু অদ্ভুত অনুভূতি অর্জন করে। যেমন এক ঘরে অনেকক্ষণ কোনো কাজ করতে করতে মনে হয় হঠাৎ যেন কে সরে গেলো সামনে থেকে, কেউ যেন শব্দ করলো কিছু। এগুলোকে আমরা অলৌকিক কিছু বলে চিহ্নিত করি। অনেক সময় বলি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের কারসাজি। অন্যমনস্ক একজন মানুষের দিকে কেউ হয়তো কয়েকবার

তাকালো, কিছুক্ষণ পরেই দেখা গেলো সেও চোখ তুলে দেখলো, খুব প্রিয় কারো দীর্ঘদিন অদর্শনে মন খারাপ করছে, বারবার আকুল হৃদয়ে দেখা করার আবেগ কষ্ট দিচ্ছে– হঠাৎ সে চলে এলো। আমরা বলি টেলিপ্যাথি কাজ করেছে।

রাস্তায় দূর থেকে দু'তিনটে ছেলেকে দেখে মেয়েটির মনে হলো ওরা ঠিক সুবিধার নয়, কোনো ক্ষতি করতে পারে। সতর্ক হয়ে গেলো সে। পরে জানলো লোকগুলি অল্পবয়সী মেয়েদের নানাভাবে উত্যক্ত করে গণ্ডগোল পাকায় প্রায়ই। সাধারণত সবাই বলে, মেয়েদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বা সিক্স সেন্স খুব প্রখর হয়।

সিক্স সেন্স ব্যাপারটা আদতে কী? আমরা তো পঞ্চইন্দ্রিয়ের কথা জানি। পাঁচরকম অনুভূতির বাহক তারা। তাহলে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ব্যাপারটা কী, কেমন, তার অস্তিত্বই বা কোথায়, সেটি কি সত্যিই সবার মধ্যে থাকে? মেয়েদের আলাদাভাবে এ ব্যাপারে চিহ্নিতই বা করা হয় কেন? কী বলেন বিশিষ্ট মনোরোগ বিশেষজ্ঞ **ডা. দেবাঞ্জন পান**।

তাঁর কথায়, সাইকোলজিক্যাল দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের কিছু কনসেপ্ট আছে। একটা প্রিমোনিশান, কিছু হতে পারে, কিছু ঘটতে চলেছে, কে যেন চলে গেলো সামনে দিয়ে, কেউ যেন তাকিয়ে রয়েছে, এসব বোধ যে নিছক মিথ্যা বা ভুল এমনটা বলা যায় না। মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে জানি যে এটা হতে পারে, কীভাবে হতে পারে তার কিছু ব্যাখ্যাও রয়েছে। পাশাপাশি খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল সত্যিই সিক্স সেন্স বলে কিছু আছে। আমরা পাঁচটি সেন্সের কথা জানি। কিন্তু এর বাইরেও ষষ্ঠ সেন্স আছে। বিজ্ঞানীরা একে বলছেন প্রো-প্রায়োসেপশান। এটা একটি ফাংশান। এটা যদি ঠিকঠাক থাকে তবে একজন মানুষ তার পজিশনটা বুঝতে পারে। তার শরীর কোথায় রয়েছে, শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাত, পা, মুখ, মাথার অবস্থান কোথায় সে বিষয়ে সে ওয়াকিবহাল থাকে। প্রো-প্রায়োসেপশান যদি ঠিকঠাক থাকে, যেহেতু এটা একটি ফাংশান– এর জন্যই আমরা আমাদের শরীরের অবস্থান বুঝতে পারবো। এটা যে সত্যি সত্যিই একটা সেন্স সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা আরো বিস্তৃত গবেষণা করছেন। আমেরিকার ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ্ (এনআইএইচ)-এ এই বিষয়ে বিজ্ঞানী ক্রাস্টা বোনম্যান (Carsta Bonnmann) পেডিয়াট্রিক নিউরোলজিস্ট দারুণ একটা কাজ করেছেন। তিনি ৯ বছরের একটি মেয়ে আর একজন উনিশ বছরের এক তরুণীর চোখ বেঁধে দিয়ে লক্ষ্য করলেন অদ্ভুত তাদের প্রতিক্রিয়া। দেখলেন তাদের কোনো পজিশন সেন্স থাকছে না। তারা বুঝতে পারছে না তারা কোথায় আছে, তাদের হাত-পায়ের পজিশনও বুঝতে পারছে না তারা। দু'জনের মধ্যে এই অদ্ভুত মিল গবেষককে ভাবিয়ে তুললো। তিনি এই বিষয় নিয়ে বিস্তৃত গবেষণা শুরু করলেন। আবিষ্কার করলেন ওই দু'জনের মধ্যে এক ধরনের একটি জিনের উপস্থিতি যার নাম PIEZO। ঐ দু'জনের ক্ষেত্রে ঐ জিনটির মিউটেশন ঘটায় এই প্রো-প্রায়োসেপশানটা ঠিক থাকছে না। যদিও এ বিষয়ে আরো অনেক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন বিজ্ঞানীরা। এই আবিষ্কার আমেরিকার নামকরা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা অনেকেই এখন সহমত পোষণ করছেন যে সত্যিই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় রয়েছে। তার নাম প্রো-প্রায়োসেপশান। নিউরোলজির দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, প্রো-প্রায়োসেপশনের অভাব থাকলে সেই মানুষটি নিজের পজিশন সম্পর্কে বিভ্রান্তিতে ভোগে। অর্থাৎ PIEZO, জিনটির অনুপস্থিতিতে তা হতে পারে।

এই সিক্স সেন্স কিন্তু আমাদের একটা সারভাইভাল সিস্টেম। এই সিক্স সেন্স আছে বলেই আমরা অনেক বিপদের আগাম আঁচ পাই। সাইকোলজিক্যাল অ্যাঙ্গেল থেকে এ বিষয়ে ভাবতে গেলে ১৯৩০ সালে আইনস্টাইনের একটা কথা মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন, দ্য ওনলি রিয়েল ভ্যালুয়েবল থিং ইজ ইনটিউশন। একজন মানুষের বুদ্ধি, মেধা পরিশ্রম যাই থাকুক না কেন, ইনটিউশন বা আমরা যাকে সিক্স সেন্স বলছি এটিই কিন্তু একজন মানুষের থেকে আর একজন মানুষের পার্থক্য সূচিত করে। এটি যার খুব প্রবল সে অনেকদূর এগিয়ে থাকে।

গবেষণা করে দেখা গিয়েছে (ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি-তে) যে ব্রেনের মাঝখানে একটা সেন্টার থাকে এসিসি (অ্যান্টিরিয়াল স্টিম্যুরিয়াল কর্টেক্স) যা আমাদের মনের সঙ্গে সংযোগ সাধন করতে পারে। আমাদের সিক্স সেন্সের সঙ্গে যার সম্পর্ক রয়েছে। সিক্স সেন্স নিয়ে যেসব গবেষণা চলছে তার সবগুলিই বলা যায় কিছুটা প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। সিলমোহর দেবার মতো জায়গায় পৌঁছায়নি। তবে এইসব গবেষণা থেকে কিছু প্রতিপাদ্য বেরিয়ে আসছে যা ষষ্ঠেন্দ্রিয় সম্পর্কে নানা ধরনের তথ্য জানান দিয়ে চলেছে।

যাদের সিক্স সেন্স বেশ প্রবল তাঁদের কিছু অদ্ভুত চরিত্র-লক্ষণ দেখা যায়। যেমন অনেকে ইনার ভয়েস শুনতে পান– কেউ যেনো নির্দিষ্ট কোনো কাজ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁদের নির্দেশ দেয়। এই মানুষগুলি একাকিত্ব পছন্দ করেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা সৃজনশীল হয়ে থাকেন। এরা একটু অ্যানালিটিকাল, তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষক, যেকোনো জিনিস খুঁটিয়ে দেখেন বা ভাবেন। শরীরের বিভিন্ন অনুভূতি সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ ও স্পর্শকাতর। এঁরা কঠোর নিয়মে বদ্ধ থাকতে পছন্দ করেন না। ঝুঁকি নিতে পছন্দ করেন। সিক্স সেন্সের বেশি প্রয়োগের ফলে অনেক সময় নানারকম ভুলভ্রান্তিও অবশ্য ঘটে থাকে এঁদের কাজকর্মে।

সিক্স সেন্সের আধিক্য কারো মধ্যে থাকার পিছনে বিজ্ঞানীরা কিছু দিক, কিছু কারণ খুঁজে পেয়েছেন। এঁদের ছোটবেলা থেকে চাইল্ডহুড ট্রমা থাকতে পারে। শৈশবে কোনো নেগেটিভ ঘটনার শিকার হতে পারে সে। তাদের কারো ব্যক্তিগত সাইকোপ্যাথলজিক দিক থাকতে পারে, থাকতে পারে অতিরিক্ত নিউরোটিক ট্রেড বা থাকতে পারে অতিরিক্ত অ্যাংজাইটি। ছোটোখাটো বিষয়ে এদের টেনশন বেশি হয়। সবকিছুর মধ্যে সে প্যাটার্ন খুঁজে পেতে চায়। সিক্স সেন্সের আধিক্য যাদের মধ্যে তাদের সিলেকটিভ অ্যাটেনশন থাকতে পারে। কোনো একজন বন্ধুর সঙ্গে হয়তো বেশি যোগাযোগ, সবসময় কথাবার্তা, ঘনিষ্ঠতা থাকে। অনেকসময় দেখা গিয়েছে তার একটা ফোন এলে সেই ব্যক্তির মনে হতে পারে তার সিক্স সেন্সের জন্য টেলিপ্যাথি ঘটেছে। অনেকের আবার ব্যাড ফিলিং (হানচ) বেশি থাকে ফলে তার রেফারেন্সিয়াল ফিলিং বেশি হয়। যার ফলে

তার মনে হয় তাকেই নিয়ে বোধহয় কেউ কথাবার্তা বলছে। এটার যদি মাত্রা বেড়ে যায় তবে তা ডিলিউশনে পরিণত হতে পারে যা স্কিজ্রোফেনিয়াতেও হয়। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় প্রবল যাদের তাদের আবার ইগোসেন্ট্রিসিজম বা আত্মকেন্দ্রিকতা বেশি দেখা যায়। রিসার্চ বলছে, এরা নিজেদের কেন্দ্র করে কোইনসিডেন্স খোঁজে, নিজেকে বিশেষ ব্যক্তি ভাবে। তার বিশ্বাস সে সবার চেয়ে আলাদা, তার আনরিলায়েবল মেমরি।

আমাদের স্মৃতি আমাদের সঙ্গে অনেক সময় গেম খেলে। স্বপ্নের মধ্যে এমন কিছু ঘটনা দেখলো কেউ, বাস্তবে হয়তো সমাপতন হল তার কিছুটা। এটাকে বলে প্রিকননাইটিভ ড্রিম। যার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় প্রবল সে ভাববে, যা সে স্বপ্ন দেখে বাস্তবে তাই ঘটে। সে স্বপ্ন দেখেছে বলেই এটা ঘটেছে। এদের চরিত্রে আরো একটা বৈশিষ্ট্য থাকে বলে জানা গিয়েছে। সাইকোফাইনেসিস থাকে অনেকের। এটা এক ধরনের বিহেভিয়ার ট্রেড। রন্ডা বার (Rhonda Byrne) -এর লেখা বই 'সিক্রেট'-এ তিনি জানিয়েছেন, তাঁর চোখের দৃষ্টি আর ওজন কমে যাচ্ছিলো তা তিনি নিজেই উইশ থিংকিং দিয়ে সারিয়ে ফেলেছেন। তাঁর দাবি চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়ার ব্যাপারটায় তিনি নিরাময় হয়েছেন এই পদ্ধতিতে। ওজনও ঠিকঠাক জায়গায় এনেছেন একইভাবে। তাঁর উইল ফোর্স– আমি সুস্থ হবো এই তীব্র মনস্তাত্ত্বিক অভীপ্সা তাঁকে সাফল্য এনে দিয়েছে বলে তিনি তাঁর বইয়ে দাবি করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের জোরেই তিনি সুস্থ হয়েছেন।

প্রবল ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের অধিকারীরা আবার বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যেও কিছু অদ্ভুত কারণ খুঁজে বের করে। দু'টো ঘটনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হলেও এরা তার মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে বের করে। কিন্তু যেহেতু তারা একটা প্যাটার্নে বিশ্বাসী তাই যেকোনোভাবেই দুই ঘটনার মধ্যে সংযোগ বের করে ফেলে।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যাদের অন্যদের তুলনায় প্রবল তারা অনেকেই ভাবে কেউ তাকে দেখছে। কেউ তাকে অনুসরণ করছে। এছাড়া 'দে জা ভু' এই ফরাসি শব্দের অর্থ নতুন জায়গায় গেলে সেটিকে পূর্ব পরিচিত মনে হওয়া। তা এদের ক্ষেত্রে প্রায়শই ঘটে। অবচেতনে এরা সবসময় প্যাটার্ন খোঁজে। যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে সিক্স সেন্সের কারণে অনেকসময় বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া গেছে এমন উদাহরণ রয়েছে কিছু।

জন লেননকে যে মেরেছিলো তার নাম মার্ক ডেভিড চ্যাপম্যান। মৃত্যুর আগে তিনি বহুরকম প্যাটার্ন দেখতে পেয়েছিলেন, তাতে বার বার তার মনে হতো এমন কিছু ঘটবে।

ফিলিং অব প্রেজেন্স– এটা হয় ষষ্ঠেন্দ্রিয় প্রবল যাদের। খুব ঠাণ্ডা জায়গায়, হাই-এলটিচিউড বা খুব উঁচু জায়গায় গেলে এদের অনেকের মনে হয় সঙ্গে যেন কেউ রয়েছে। খুব ক্লান্ত থাকলেও হয়, আবার প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত থাকলেও মনে হয় কেউ যেন কাছাকাছি তার অস্তিত্ব নিয়ে রয়েছে। স্যার স্যাকেলটন সাহেব তাঁর দু'জন সঙ্গী নিয়ে আন্টার্টিকায় গিয়েছিলেন। ৩৬ ঘণ্টা ঘুরেছিলেন। ওঁদের মনে হতে লাগলো দলে ওঁরা চারজন রয়েছেন।

ওবিই বা আউটসাইড বডি এক্সপিরিয়েন্স অনেকেরই হয়। সবারই প্রায় জীবনের কোনো না কোনো পর্বে কখনও মনে হয় কেউ বোধহয় তাকে স্পর্শ করে গেলো। কারো হাতের ছোঁয়া লাগলো। এমনকি শরীর মনে সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের জীবনেও এমন ঘটনা ঘটে।

এনডিই বা নেয়ার ডেথ এক্সপিরিয়েন্স বিশেষ করে কেউ যদি ডুবন্ত অবস্থা থেকে বেঁচে ফেরে তার মনে হয় সে তো অজ্ঞানই ছিল, কেউ একজন তাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেলো।

ইউনিভার্সিটি অব বার্মিংহাম-এর বিজ্ঞানী জাসন ব্রেথ ওয়েলট তাঁর গবেষণায় দেখেছেন, যাদের ওবিই আছে তারা, কর্টিকাল হাইপার এক্সাইটেবল। অর্থাৎ অতিরিক্ত উত্তেজনাপ্রবণ। অনেকের স্বপ্নের মধ্যে নানা ঘটনা ঘটল, পরের দিন হয়তো বা আরো পরে এই ধরনের ঘটনার সমাপতন ঘটল বাস্তবে। র‍্যাপিড আই মুভমেন্ট স্লিপ যাদের বেশি হয় তাদের এই ধরনের অভিজ্ঞতা হয়।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নিয়েই কি আমরা জন্মাই? আমাদের ব্রেন এমনভাবে তৈরি করে যে আমাদের ইন্সটিংট বা ইমপাল্‌স আর ইনটুইশন রক্ষা করে নানা বিপদ থেকে আমাদের। এর মধ্যে ইনসটিংস নিয়ে আমরা জন্মাই। কিছু ইনটুইশনও জন্মাবধি থাকে আর বাকিটা পরে তৈরি হয়। মানুষ যে ইনটুইশন নিয়ে জন্মায় তার একটি হলো, লোকালাইজেশন অব সাউন্ড। কোন শব্দ কোথা থেকে আসছে তা বুঝতে পারা। আরো একটি ইনটুইশনের উদাহরণ হলো দু'জন সমান গুণরূপ সম্পন্ন বিপরীত লিঙ্গের মানুষ সামনে এলে ইনটুইশন ঠিক করে দেয় মানুষটি কার প্রতি আকর্ষিত হবে। এটা ব্রেন ঠিক করে দেয়। দু'জনের শরীরের ঘ্রাণ ভিন্ন, যা ধরে নিতে পারে ব্রেন। সে-ই ঠিক করে দেয় কে তার উপযুক্ত। বাকি যে ইনটুইশন তা মানুষের পরবর্তীকালে অর্জিত হয় বা ভেতরে তৈরি হয়। অবচেতনে মানুষ অনেক জিনিস শিখে নেয়।

মানুষের ভেতরে যেসব ইনটুইশন থাকে তা আবার দু'ভাবে তৈরি হয়। তার একটা ইমপ্লিসিট ও অন্যটি এক্সপ্লিসিট লার্নিং। এক্সপ্লিসিট লার্নিং হল সচেতনভাবে শেখা। ইমপ্লিসিট লার্নিং অজান্তে শেখা। আমাদের নানা অভিজ্ঞতা আশপাশের শিক্ষা, নানা ঘটনা, স্মৃতি এগুলি অজান্তে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় হয়ে ওঠে। যাকে বলা যায় নোয়িং উইদাউট নোয়িং। না জেনেও জানা।

এই জানাটাই সিক্স সেন্স যা খুব সহজেই বুঝতে শেখায় একজন মানুষের কোন হাসিটা ছবি তোলার জন্য তৈরি করা হাসি আর কোনটা স্বতঃস্ফূর্ত হাসি। নিজের অজান্তেই এই শিক্ষা, যাকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা বলা যায়, তা মানুষকে অনেক বিষয়ে সচেতন করে, বুঝতে শেখায় অনেক কিছু।

## ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় কীভাবে মানুষকে রক্ষা করে?

পুলক শাণ্ডিল্য

কখনো কখনো আমাদের রুটিনমাফিক ৬-১০ টার জীবনের একঘেয়ে স্থূল অভিজ্ঞতার বাইরে, মুক্ত বিহঙ্গের মতো, আকাশের বুকে মুক্ত বাতাসে ডানা মেলে দিতে ইচ্ছা করে। ইচ্ছা করে, অনন্ত আকাশের অন্ত খুঁজে পেতে, আর এই খুঁজতে খুঁজতে, আকাশের অন্ত না খুঁজে পেলেও কিছু পাওয়া যায়, যা প্রকৃত অর্থেই অলৌকিক। কিন্তু খোঁজাটা ঠিকঠাক হওয়া চাই। না, খোঁজাটা কল্পনার আকাশে নয়– প্রাত্যহিক জীবনেই, খোঁজার অভিমুখ বদলে ফেলে।

সমরেশ আমাদের অফিসের বন্ধু, সমরেশ চ্যাটার্জি। সমরেশ একজন ছাপোষা সাধারণ ভদ্রলোক। আর পাঁচজন সাধারণ লোকের মতোই। অবশ্য এতদিন সেরকমই জানতাম। কিন্তু একদিনের একটি ঘটনা আমাদের এই ধারণাটাকে একেবারে বদলে দিল।

একদিন সবে অফিসে গেছি। শুনতে পেলাম হলঘরে ছেলেগুলো কোনো একটা বিষয় নিয়ে নিবিড় আলোচনায় ব্যস্ত। একটু মন দিতেই বুঝতে পারলাম, ওরা কোনো গাড়ি কেনার ব্যাপারে আলোচনা করছে। প্রত্যেকেই তখন এক একজন গাড়ি বিশেষজ্ঞ। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই আলোচনার শেষ পরিণতি যে এত বিস্ময়কর ও মর্মান্তিক হবে, সেটা কেউই তখন আঁচ করতে পারিনি।

**সেই কথাটাই বলি:**

আসলে ওরা আমাদেরই একজন অফিসার বিশ্বজিৎ-এর গাড়ি কেনার ব্যাপারে আলোচনা করছিল। ইতোমধ্যে আমিও গুটি গুটি পায়ে আলোচনায় ঢুকে গেছি। আমার পিছু পিছু সমরেশও এসে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বজিৎ বলছে, সে অফিসের কাছেই একটি মোটর গাড়ির গ্যারেজে, সেকেণ্ড হ্যান্ড গাড়ি বায়না করে এসেছে; আর ওরা সবাই কোনটা ভালো, কোনটা মন্দ এইসব আলোচনা করছে। বিশ্বজিৎ আরো বলল, ওই গ্যারেজের মালিক আজ দুপুরেই অফিসের সামনে গাড়িটা নিয়ে আসবে; তোমরা সকলেই গাড়িটা দেখতে আসতে পারো। এটাও বলল, পে-অর্ডারটা প্রস্তুত রাখতে বলেছে। পে-অর্ডার পেলেই গাড়িটা হস্তান্তর করে দেবে। বিশ্বজিৎ বলতে লাগলো, গাড়িটা পেলে, আজ সন্ধ্যাবেলাই পুত্র-পরিবার নিয়ে দিদিদের বাড়ি যাবো। আমি বললাম, নিশ্চয়ই যাবে। দৃশ্যতই বিশ্বজিৎ-কে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছিলো। সেদিন যথারীতি সকাল গড়িয়ে দুপুর হল। গ্যারেজের মালিকও যেমন কথা দিয়েছিলেন, ওই গাড়িটা নিয়ে সরাসরি অফিসের সামনে এসে হাজির। অমনি সবাই সমস্বরে 'চল, দেখবে চল' বলে চিৎকার করতে করতে অফিসের বাইরে চলে গেলো। কিছুক্ষণ বাদে সমরেশ আমার টেবিলে এলো। বলল, চল গাড়িটা দেখে আসি। আমি বললাম, আমার বিশেষ কাজ আছে, তুই দেখে আয়।

একটা চেঁচামেচির শব্দে হঠাৎ ছন্দপতন হয়ে গেলো। শুনলাম, বিশ্বজিৎ আর ওই ছেলেগুলি সমরেশকে কী সব অপমানজনক কথা বলছে। খুব বিব্রত বোধ করতে লাগলাম। কথার ভেতর বিশ্বজিৎ-কে বলতে শুনলাম, সমরেশ-দা, তুমি আবার কবে থেকে এইসব বুজরুকি শুরু করলে? আমি কত আশা করে, আজকে অফিসে এসেছিলাম; দিলে তো সব ভেস্তে! মনে খুঁতখুঁতুনি নিয়ে কি কিছু কেনা যায়? এইরকম আরো কত কথা।

সমরেশ একজন নিপাট ভদ্রলোক। সমরেশকে এরকম অপমানিত হতে দেখে আর চুপচাপ থাকতে পারলাম না। বিশ্বজিৎ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হ্যাঁরে, ঘটনাটা কী হয়েছে? সমরেশ তোর কী ভেস্তে দিয়েছে? বিশ্বজিৎ বলতে লাগলো, সমরেশ-দা বেশ উৎসাহের সঙ্গেই গাড়িটা দেখতে গিয়েছিল। কিন্তু গাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেলো আর দ্রুত পায়চারি করতে লাগলো। তারপর আমাকে একটা কোণে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, বিশ্বজিৎ এই গাড়িটা তুই কিনিস না, এটা অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন কার। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কী করে জানলে? তুমি

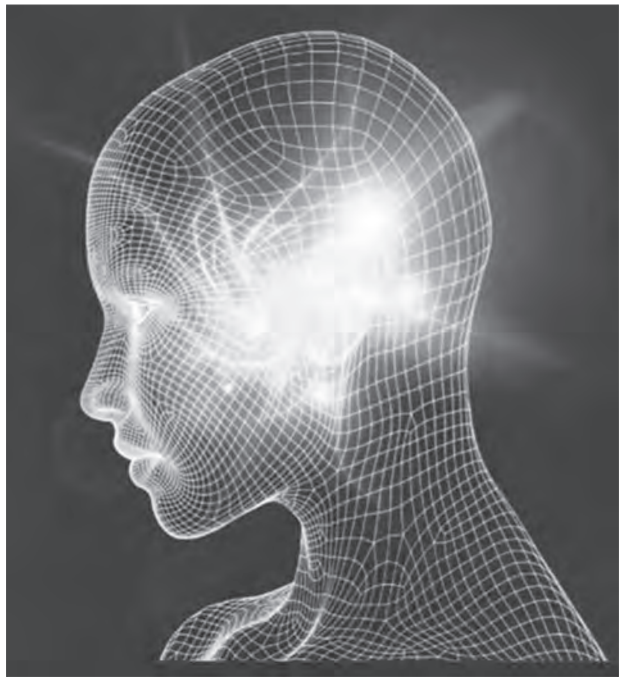

কি অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ার? উত্তরে সমরেশ-দা বলল, আমার মনে হচ্ছে এবং আমি এই ব্যাপারে নিশ্চিত। তারপর তুই কী করবি সেটা তোর ব্যাপার। এইসব শোনার পর, মনে একটা খুঁতখুঁতুনি ধরবে না? আমি এর উত্তরে বিশ্বজিৎ-কে কী বলবো ভেবে পেলাম না। সমরেশকেও আর কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না। কিন্তু মনে একটা বিস্ময় থেকেই গেলো।

পরের দিন সকালে অফিস গিয়ে শুনলাম, বিশ্বজিৎ গতদিন সন্ধ্যাবেলায় ওদের বাড়ির কাছে এক বিখ্যাত জ্যোতিষের কাছে বিষয়টি বিস্তারিত বলে এবং গাড়িটি নেবে কি-না সেই সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত জানতে গিয়েছিলো। উনি সব শুনে বলেছেন, দেখো, যে বস্তুতে প্রাণ আছে তার ভবিষ্যৎ বলাই অনেক কঠিন কাজ; তা তোমাদের অফিসের ওই ভদ্রলোক কত বড় জ্যোতিষ যে একটা নিষ্প্রাণ বস্তুরও ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন। অন্তত আমার ৩০ বছরের জ্যোতিষ অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি এটা বলতে পারা অসম্ভব। তবে এইটুকু বলতে পারি, মনের ভেতর কোনো খুঁতখুঁতুনি

রেখে এইসব জিনিস কেনা উচিত নয়। যাই হোক, এইসব শুনে বিশ্বজিৎ ঠিক করেছে গাড়িটা আর কিনবে না। এতে আমরাও নিশ্চিন্ত হলাম। কয়েক মাস কেটে গেছে। ইতোমধ্যে আমি অন্য ব্রাঞ্চে ট্রান্সফার হয়ে গেছি। কিন্তু সমরেশের কথাটা মাঝে-মাঝেই মনে উদয় হতো।

এর কিছুদিন বাদে একদিন অফিস থেকে ফিরেছি। চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে টিভির সামনে বসেছি। তখন সন্ধ্যাবেলা 'খাস খবর' বলে খবরের একটা প্রোগ্রাম হতো। তাতে দেখছি, এতটা ভয়ঙ্কর গাড়ি দুর্ঘটনার ছবি দেখাচ্ছে। ঘটনাটা দ্বিতীয় হুগলি সেতুর উপর। তাতে দেখছি গাড়ির সামনেটা পুরাটা তুবড়ে ঢুকে গেছে। সামনের দরজাটা ভেঙে পড়ে গেছে। খবরে বলছে, গাড়ির আরোহী ছিলেন স্বামী-স্ত্রী ও তাদের কয়েক মাসের মেয়ে। দুর্ঘটনায় স্বামী-স্ত্রী দুর্ঘটনাস্থলেই মারা গেছেন। বাচ্চাটা গাড়ির দরজা ভেঙে যাওয়ায় উড়ে এসে একজন কর্তব্যরত পুলিশের হাতের কাছে আসে এবং সে বাচ্চাটাকে ধরে নেয়। বাচ্চাটি বেঁচে যায়। কিন্তু এরকম একটা দু'টো দুর্ঘটনার কথা তো প্রতিদিনই খবরে থাকে। সুতরাং, এটাকে আর গুরুত্ব দিইনি। পরদিন সকালে তখনও ঘুম থেকে উঠিনি। বারংবার ফোনের আওয়াজে ঘুম ভাঙলো। ফোন ধরে বুঝলাম ওই প্রান্তে বিশ্বজিতের গলা, বিশ্বজিৎ খুব কাঁদছে, আর বলছে, সমরেশ-দা খুব জোর বাঁচিয়ে দিল, খুব জোর বাঁচিয়ে দিল। আমি বলছি, ঠিক বুঝতে পারলাম না, পরিষ্কার করে বল। বিশ্বজিৎ বলল, মর্গ থেকে বলছি। এখন আর সব কথা বলবার মানসিক অবস্থা নেই। পরে, অফিসে এসে শুনে নিও; রাখলাম।

অফিসে গিয়ে সব কথা শুনে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। শুনলাম, বিশ্বজিৎ গাড়িটা না কেনার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর ওই গ্যারেজেই গাড়িটা কয়েক মাস পড়েছিল। ওই গ্যারেজের মালিক কিন্তু গাড়িটাকে ঝকঝকে রাখতো, যাই হোক, কয়েক মাস বাদে বিশ্বজিৎ-এর এক ভায়রাভাই বিশ্বজিৎ-কে বলে, একটা সেকেণ্ড হ্যান্ড ভালো গাড়ি দেখে দিতে, তখন বিশ্বজিৎ ওর ভায়রাকে বলে, দেখো একটা খুব ভালো গাড়ি আমার সন্ধানে আছে, কিন্তু আমার অফিসের এক ভদ্রলোক বারণ করায় আমি কিনতে গিয়েও পিছিয়ে আসি। বলা বাহুল্য ওর ভায়েরা কোনো জ্যোতিষ, অলৌকিক কিছুতে বিশ্বাস করতো না। যাই হোক বলে, চলো বিশ্বজিৎ, আজই গাড়িটা দেখবো। ইতোমধ্যে বিশ্বজিৎ-কে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের অফিসের ওই ভদ্রলোক ঠিক কী বলেছিলেন? বিশ্বজিৎ বলে, উনি গাড়িটা দেখেই বললেন, এই গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন কার। ভায়রা বলল, এই শুনেই তুমি পিছিয়ে এলে? তোমার মানসিক জোর বলে কিছু নেই? চল, আজই গাড়িটা দেখবো, গাড়িটা দেখেই ওর ভায়রার খুব পছন্দ হয়ে গেলো এবং কেনার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস গাড়িটা কিনে তিন মাসও চড়তে পেলো না। দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে ঘটনাটি ঘটে গেলো।

এই ঘটনার পরে বিশ্বজিৎ অফিসে সকলের কাছে বলতে লাগলো সমরেশ-দা আমার ভগবান। আমার মনে প্রশ্নটা থেকেই গেলো, সমরেশ কী করে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। ঠিক করলাম একদিন সমরেশের কাছে গিয়ে আমার ভবিস্যৎ সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করবো। সমরেশ-দাকে বলতেই বলল, আমি জ্যোতিষবিদ্যা জানি না। আমি তখন একটু ক্রোধান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তুমি কী? তোমার এই ক্ষমতা কোথা থেকে এলো? একটু থেমে, সমরেশ-দা বলল, এই ব্যাপারটা আমার উপনয়নের পর থেকেই মাঝে মাঝে হয়।

সমরেশ বলল, তাহলে শোন; জীবনে এই ব্যাপারে প্রথম অভিজ্ঞতার কথা বলি। তখন আমার দিদি বর্ধমানে থাকতো। জামাইবাবু বর্ধমানে পোস্টিং ছিলেন। প্রায়ই দিদির বাড়ি গিয়ে ১৫ দিন, একমাস করে কাটিয়ে আসতাম। একবার লোকাল ট্রেনে বর্ধমান থেকে, নারায়ণ বলে বন্ধুর সঙ্গে ফিরছি। দু'জনেই বসবার জায়গা পেয়েছি। খুব গল্প করতে করতে চলেছি। বেশ কয়েকটা স্টেশন পেরিয়ে গেছে। আমাদের সামনের সিটেই একজন অতীব সুন্দরী মাঝ বয়সী মহিলা বসেছিলেন। গায়ের রং চাঁপা ফুলের মতো। ভদ্রমহিলার চেহারা দেখলেই বোঝা যায় খুব বড় ঘরের বউ বা মেয়ে। ওঁর চেহারায় এমন একটা ব্যক্তিত্ব যে চট করে কথা বলতে ভয় হয়। আমার তখন ১৮-১৯ বছর বয়স। আর ভদ্রমহিলার ৪০-৪২ হবে। ভদ্রমহিলার কপালের দিকে তাকিয়ে একটু আশ্চর্য হলাম। অত ঝকঝকে কপালের বাঁদিকে একটা কালো স্পট দেখতে পাচ্ছি। খুব অড লাগছে। যেন সাদা দুধে চোনা ফেলে দিয়েছে। আমি নারায়ণকে বললাম, ভদ্রমহিলার কপালের বাঁদিকে একটু তাকিয়ে দেখ। ওই কালো স্পটটা খুব অড লাগছে না! নারায়ণ বলল, কই, কোনো স্পট তো নেই। আমি বললাম, তোর চোখে কী হয়েছে? ভালো করে দেখ। নারায়ণ বলল, নারে ভালো করেই দেখেছি। পরিষ্কার সুন্দর কপাল। আমি তখন দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। হঠাৎ মনে মনে ওটার ডিকোডিং হল যে ভদ্রমহিলা ওঁর স্বামীর ব্যাপারে কোনো অশান্তিতে আছেন; সেই আশঙ্কার কথা ফিসফিস করে নারায়ণকে বললামও। নারায়ণ বলল, যাক গে, ওসব পাগলামি ছাড়। পাবলিকের প্যাঁদানি খাবি না কি? আমি কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ হয়ে গেলেও, মনের ভিতর ভাবনাটা ঘুরপাক খেতে লাগলো। কয়েকবার বলবার চেষ্টা করেও ভদ্রমহিলাকে কিছু বলবার সাহস হয়নি। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি স্টেশন পেরিয়ে গেছে। হাওড়া স্টেশন আসতে আর ৯-১০টি স্টেশন বাকি। আমি একটু সাহস সঞ্চয় করে ভদ্রমহিলাকে বলেই ফেলাম, 'আপনি কি আপনার স্বামীর ব্যাপারে বিশেষ অশান্তিতে আছেন?' ভদ্রমহিলা শুনেই প্রথমটা হকচকিয়ে গেলেন, তারপর কাঁদো কাঁদো স্বরে বললেন, তোমায় তো ভাই আমি চিনি না! তুমি একথা জানলে কী করে? সমরেশ বলতে লাগলো, সেই জীবনে প্রথম। এই ঘটনায় আমি নিজেও খুব বিস্মিত হলাম। ভদ্রমহিলা বললেন, তুমি কোথায় থাকো? আমি বললাম দমদমে। যাই হোক, একটু আলাপ পরিচয় হল। ভদ্রমহিলা জানালেন, তাঁর স্বামী একটা বড় মার্চেন্ট কোম্পনিতে চিফ অ্যাকাউন্ট্যান্ট। কোনো একটা আর্থিক কেলেঙ্কারিতে ফেঁসে এখন জেলে আছেন। ভদ্রমহিলা কোর্ট-এ হেয়ারিং অ্যাটেন্ড করে বাপের বাড়িতে ফিরছেন। ভদ্রমহিলার বাপের বাড়ি হাওড়া কদমতলায়। উনি বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, কিন্তু তুমি ভাই এসব কথা জানলে কী

করে? আমি বললাম সেটা তো আমিও জানি না। ভদ্রমহিলা বলতে লাগলেন, তুমি সব জানো। এইবার বলো দেখি, আমার স্বামী কবে জেলে থেকে ছাড়া পাবে? আমি বললাম, আমি জ্যোতিষী নই এবং ওই বিদ্যাও আমার জানা নেই। ভদ্রমহিলা কেবলই বলছেন তুমি কিছু একটা বলো। আমি বিশ্বাস করি তুমি যেটা বলবে সেটাই হবে। যখন খুব জেদাজেদি করছেন তখন বলে দিলাম তিন মাস। আশ্চর্যের ব্যাপার, পরে খবর পেয়েছিলাম তিনমাস পরেই ভদ্রলোক জেল থেকে ছাড়া পান।

ঘটনাটি শোনা যখন শেষ হল তখন দেখি ঘড়িতে দুপুর বারোটা বেজে গেছে। আস্তে আস্তে বাড়ি ফেরার পথে পা বাড়ালাম। সেই মুহূর্তে চিন্তা করেও ঘটনাটার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা খুঁজে পেলাম না। ভাবতে লাগলাম, আচ্ছা, সমরেশ কি অলৌকিক শক্তির অধিকারী? কিন্তু তাই বা কী করে হয়? সমরেশ তো আর পাঁচজন সাধারণ লোকের মতোই আচরণ করে। ঠিক আছে, পরে আবার ভেবে দেখা যাবে। এইভাবে নিজেকে খুব বোকা লাগছে, আমিও তো সমরেশকে জ্যোতিষ ভেবেই নিজের ভবিষ্যৎ জানতেই এসেছিলাম।

এরপর জীবন তার নিজের ছন্দেই কয়েক বছর এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে। ইতোমধ্যে অনেককেই এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেছি। কিন্তু কারো কাছেই সন্তোষজনক কোনো উত্তর পাইনি।

সেবার কেদার-বদরী দর্শনে গিয়েছি। কেদার দর্শন ভালোভাবেই হয়ে গেছে। ওখানে গুহার মধ্যে এক দিব্যদেহী সাধুর দর্শন পেলাম। আমি সাধুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মহাত্মাজি, এক ফোটো লেলে?' উনি কটমট করে আমার দিকে দেখলেন। আমি ভয়ে, কথা না বাড়িয়ে উপর দিকে হাঁটা দিলাম। উপরে ব্যাসগুহা, গণেশগুহা দেখে যখন নেমে আসছি তখন মহাত্মাজি নিজেই প্রসন্নচিত্তে বললেন, আ বেটা, ব্যাঠ্ যা। এরপর মহাত্মাজির সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা হয়। উনি বেশিরভাগ আলোচনাটাই ইংরেজিতে করেছিলেন। কথায় কথায় তাঁকে জিজ্ঞেস করছিলাম ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে। উনি এ বিষয়ে যা বলেছিলেন সেটা যতটা মনে আছে আপনাদের বলা চেষ্টা করছি।

উনি বললেন, দেখ বাবা আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ধারণের জন্য পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়ের প্রয়োজন হয়। এই ইন্দ্রিয়গুলির কার্যক্ষমতা সীমিত। এইসব আমাদের স্থূল দেহের সঙ্গে যুক্ত। যেমন, আমরা কান দিয়ে শুনি। একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শব্দ আমরা শুনতে পাই। তার থেকে কম হলে আমরা শুনতে পাবো না। আর বেশি হলে কানের পর্দা ফেটে যাবে। আর যদি কোনো শব্দ অনেক দূরে হয় তাহলেও শুনতে পাবো না কারণ, ওই শব্দতরঙ্গ বায়ুর মাধ্যমে কানে এসে পৌঁছুলে তবেই আমরা শুনতে পাবো। একইভাবে আরো যে চারটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, তাদের ক্ষেত্রেও এটা সত্যি। যেমন একটি নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই। অর্থাৎ এই সীমিত ব্যাপারটাই স্থূলদেহের বৈশিষ্ট্য। এই অনুভূতিগুলির সূক্ষ্মতার দিকটা যদি আমরা বুঝতে পারি তাহলেই ষষ্ঠেন্দ্রিয় সম্বন্ধে বুঝতে পারবো। সাধুবাবা কথা বলছেন, আর মাঝে মাঝে ধুনি তেকে ছাই নিয়ে সারা গায়ে মাখছেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া চলছিলো। যথেষ্ট শীতের পোশাক পরা সত্ত্বেও আমি ঠাণ্ডায় কাঁপছি। আর সাধুবাবা একটি মাত্র লাঙট পরে খালি গায়ে ওই পর্বতগুহায় দিন-রাত বসে আছেন, ভেবে খুব আশ্চর্য লাগলো। যাই হোক, প্রসঙ্গে ফেরা যাক। মহাত্মা সূক্ষ্ম অনুভূতির কথা বলছিলেন। এই গুহার সামনে এসে যখন বসলাম, তখন থেকেই একটু সুন্দর তাজা ফুলের মতন গন্ধ পাচ্ছিলাম। ইতোমধ্যে কিছু যাত্রী আমার দেখাদেখি পাশে এসে বসেছে। সাধুবাবা বিরক্ত হননি। তাদের মধ্যে দু'একজনকে আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞাসা করলাম ওই ফুলের সুবাস পাচ্ছে কি-না। তারা বলল কই না তো। আমি তখন সাধুবাবাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করলাম, কেয়া মহারাজজি, আপকো কোই তাজা ফুল কি খুসবু মিলতা হ্যায়, কেয়া? মহাত্মাজি তার উত্তরে বললেন, আপনি যে বিষয়টা জিজ্ঞাসা করছেন তার উদাহরণ আপনি এখনই পাচ্ছেন। এটা গন্ধের সূক্ষ্ম অনুভূতির জন্য সম্ভব হচ্ছে। আমি তখন ভাবলাম, সত্যিই তো অন্য যাঁরা ওখানে উপস্থিত রয়েছে তাঁরা তো গন্ধটা পাচ্ছিলো না। সাধুবাবা বললেন ইংরেজিতে এটাকে বলে এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশন।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার কথা, আমার পরম গুরুদেব শ্রীশ্রীকুলদানন্দ ব্রহ্মচারীজির ডায়েরিতে অনেকদিন আগে পড়েছিলাম। তখন আমার পরাগুরুদেব, মহাযোগী, পরমবৈষ্ণব, শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজি ঢাকার গেণ্ডারিয়া আশ্রমে মাঝে মাঝে থাকতেন। উনি কখনো কখনো আশ্রমের মাঠে একটি আমগাছের নিচে বসতেন; ওই আমগাছ থেকে মধুক্ষরণ হয়েছিলো। একদিন ওই গাছের নিচে গোঁসাইজি বসেছিলেন, ব্রহ্মচারীজি কাছেই ছিলেন। হঠাৎ গোঁসাইজি বললেন, ব্রহ্মচারী কাউকে বল, সামনের ওই গাছটাতে সার দিয়ে পিঁপড়ে উঠছে সেগুলি যেন তাড়িয়ে দেয়। ব্রহ্মচারীজি দেখলেন সামনের যে গাছটার কথা গোঁসাইজি বলছেন, সেটা ওখানের থেকে বেশ অনেকটা দূরে। ব্রহ্মচারীজি ভেবে অবাক হলেন যে, অতদূরে গাছে ওঠা পিঁপড়ে গোঁসাইজি কী করে দেখলেন?

এই ঘটনাটা স্মৃতিতে আসতেই আমার মনে হল সাধুবাবা এটাকে হয়তো সূক্ষ্ম দৃষ্টির কথা বললেন। এটা দেখার এক্সট্রা সেনসরি পারসেপশন। এই প্রকারের দূরদর্শন, দূরশ্রবণ যোগীদের পক্ষে সম্ভব। এইটা ভেবে অবাক হচ্ছি যে সমরেশ তো যোগী নয়, সাধারণ মানুষ; সাধুবাবার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওর ওইসব বুঝতে পারাটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়েরই কাজ। যাই হোক, সাধুবাবার সঙ্গে কথা বলে অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর বেশ কিছুটা পরিষ্কার হয়েছে। এখন ঘরে ফেরার পালা।

কলকাতায় ফিরে যথারীতি অফিসে জয়েন করে গেলাম। সমরেশকে ফোনে বললাম, সামনের রবিবার তোর বাড়িতে আসছি। অনেক গল্প আছে। প্রতীক্ষিত রবিবারটা এসে গেলো। সমরেশের বাড়ি সকাল ৭টার মধ্যে পৌঁছে গেলাম। তারপর শুধুই বেড়ানোর কথ াই চলছে। হরিদ্বার, হৃষীকেশ, দেবপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, শ্রীনগর ইত্যাদি হয়ে কীভাবে গৌরীকুণ্ড পৌঁছালাম ইত্যাদি। আমার কিন্তু এত কথার মধ্যেও কেবলই মনে হচ্ছে কতক্ষণে ওই সাধুবাবার সঙ্গে যে আলোচনা হয়েছে, সেটা ওর কাছে বিস্তৃতভাবে

বলতে পারবো। হঠাৎ সমরেশ বলল, ইতোমধ্যে আমার ওই জানতে পারা বা বুঝতে পারা ব্যাপারটা নিয়ে ককেজন মনস্তত্ত্ববিদের সঙ্গে কথা বলেছি। তারা সকলেই একটা কমন কথা বলেছে এটা ইনটিউটিভ পাওয়ার বা সজ্ঞাত হওয়ার শক্তি। এটা কারো কারো ভিতর জন্ম থেকেই থাকে। আরো বলেছেন, ইন্টিউশন জিনিসটার কোনো ভূমিকা তো থাকে না। অর্থাৎ এটা হলে এটা হবে, এইরকম কিছু থাকে না। যদি তাই হতো, তাহলে ইন্টিউশন-কে জ্যোতিষ বলা হতো। কিন্তু সেটা না; এটা একদম অন্যরকম একটা ব্যাপার। একটা অদৃশ্য সংগ্রহ থেকে এই ব্যক্তিদের মস্তিষ্ক ঘটনাটা রিসিভ করে। সমরেশের কথা শুনে আমি বললাম, এ তো দেখছি রেডিও বা টিভিতে যেভাবে শব্দ বা ছবি আসে তার সঙ্গে তুই যা বললি তার মিল আছে। অর্থাৎ শব্দ বা ছবির তরঙ্গদৈর্ঘ্য যার সঙ্গে মিল খায় সেই ছবি বা শব্দ আমরা রেডিও বা টিভির মাধ্যমে শুনতে বা দেখতে পাই। সমরেশ বললো, হ্যাঁ ঠিকই বলেছিস, অনেকটা সেরকম। বেলা হয়েছে। সমরেশ বলল চল, স্নান খাওয়া সেরেনি। তারপর তো সারা দুপুর আছে।

সমরেশ বলতে লাগলো, তুই তো কয়েক মাস পরে এলি। ইতোমধ্যে আরো দু'টি অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিলো। কিছুদিন আগে আমাদের এক প্রফেসর বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলাম। ওখানে গিয়ে দেখলাম ওরেদরই অন্য প্রফেসর বন্ধুরা একটা জন্ম-ছক নিয়ে আলোচনা করছে। এমন সময় রোগাটে চেহারার একজন বয়স্ক ভদ্রলোক আমাদের ঘরে এলেন। আমার প্রফেসর বন্ধুটি পরিচয় করিয়ে দিল ওর শ্বশুরমশাই বলে। তাঁকে দেখেই আমার মনে হল, ওঁর শরীরে বারবার হাড় ভেঙে যাওয়ার কথা। আমি সে কথা বলেও দিলাম। ভদ্রলোক বললেন, বাবা কী আশ্চর্য, একদম ঠিক বলেছো। বলে, পাঞ্জাবিটা তুলে তাঁর পাঁজরের কাছে প্লাস্টারটা দেখালেন। বললেন, এটা আমার ২১তম হাড় ভাঙা।

যারা জন্ম-ছক নিয়ে আলোচনা করছিলো, তাদের একজনকে দেখে বললাম, আপনার তো তবলচি হওয়ার কথা। আপনি কী করেন?

উনি বললেন আমি একটা কলেজে ইংরেজি পড়াই। কিন্তু আমার বাবা খুব ছোটবেলায় তবলা বাজানোর আগ্রহ দেখে আমায় তবলা শেখানোর জন্য কেরামতুল্লা খান সাহেবের কাছে তালিম নিতে ভর্তি করিয়েছিলেন। কিন্তু বাবার হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় আমার আর বাজানো হয়ে ওঠেনি।

এইসব শুনে সমরেশকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা তুই কি ইচ্ছা করলেই এইসব জানতে পারিস? ও একটু রেগে গেলো। বলল তাহলে এত আলোচনার পরও তুই কিছুই বুঝিসনি। এটা ইচ্ছা করে করা যায় না। আপনা থেকেই হঠাৎ ইনফরমেশনটা এসে যায়। যাই হোক, আমি হুঁ বলে চুপ করে গেলাম। পরে জিজ্ঞাসা করলাম, তুই যে বললি দু'টো ঘটনা, তাহলে আর একটি ঘটনা কী?

আমার এক জ্যাঠার ছেলে হাওড়ায় থাকে। ওর একটাই মেয়ে। ও একটা ছোটখাট ব্যবসা করে। একদিন হঠাৎ ফোন করে বলছে, জানিস সমু খুব বিপদে পড়েছি, তুই তো জানিস আমার একটাই মেয়ে, আর আমার অবস্থাটাও জানিস। ঠিক করেছিলাম ওর তো বিয়ে দিতে হবে। আস্তে আস্তে গয়নাগুলো একটু-একটু করে করিয়ে রাখি। তাহলে পরে চাপটা পড়বে না। সেই মোতাবেক এক জুয়েলারি দোকানের বন্ধুকে ৩৫,০০০ টাকা অগ্রিম দিয়েছিলাম একটা সোনার হার তৈরির জন্য। এক বছর হয়ে গেছে। আজ দেবো কাল দেবো বলে শুধু ঘোরাচ্ছে। গয়নাও দেয়নি, টাকাটাও ফেরত দিচ্ছে না, যখন ভাই জিজ্ঞেস করছে, তখন নভেম্বর মাস, আমি হঠাৎ বললাম, সামনের বছর ফেব্রুয়ারিতে পেয়ে যাবি, তার

আগে আমার ভাই বোধহয় উকিলের নোটিসও পাঠিয়ে দিল। তাতে ৫,০০০ টাকার মতো ফেরত পেয়েছিল। অর্থাৎ বেশিরভাগ টাকাটাই তখন বাকি। দিন যায়, মাস যায়। টাকা আর ফেরত পায় না। এইভাবে আস্তে আস্তে ফেব্রুয়ারি মাসও চলে এলো। দিন গুণতে গুণতে ২৭ ফেব্রুয়ারি চলে এলো, ভাই ভাবতে লাগলো, কারো কথাই মেলে না। ফেব্রুয়ারি মাসের আর একদিন বাকি। কালকে বাকি টাকাটা পাবো এমন ইঙ্গিতও কিছু পাওয়া যায়নি। মার্চ মাস শুরু হলেই আমাকে ফোন করবে বলে মনে মনে ঠিক করলো। কিন্তু বিস্ময়করভাবে ২৮ ফেব্রুয়ারি বেলায় ওই ভদ্রলোক ভাইকে কলকাতার কোনো একটি জায়গায় দেখা করতে বলল এবং বাকি টাকাটা পুরোটাই দিয়ে দিলো। আমার বাড়ি ফিরে এসেই আমাকে বেশ কয়েকবার ফোন করেছিলো। কিন্তু আমি একটি বিশেষ কাজে ব্যস্ত থাকায় ফোন ধরতে পারিনি। পরের দিন ফোন ধরতেই ওদিক থেকে ভাই বলছে, তোকে গতকাল রাতে বেশ কয়েকবার ফোন করেও পাইনি। আমি পুরো টাকাটাই ফেরত পেয়ে গেছি। সব থেকে আশ্চর্য হয়েছি যে ফেব্রুয়ারিতেই পেয়েছি। আর একদিন দেরি হলেই মার্চ হয়ে যেতো।

এই দু'টো ঘটনা শোনার পর আমি মোটামুটি নিশ্চিত হলাম। সমরেশের এই ব্যাপারটা খুব সাধারণ নয়। এটা একটা অকাল্ট পাওয়ার। সাধুবাবা কথাপ্রসঙ্গে এটাও বলেছিলেন, যে কেউ কেউ হয়তো, পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে, এই শক্তিটা নিয়ে জন্মায়; আর যারা সঠিক সাধনভজনের দ্বারা অধ্যাত্ম পথে কিছুটা অগ্রবর্তী হয়, তাদের ভিতরেও এই ক্ষমতা দেখতে পাওয়া যায়। সমরেশকে এইসব কথা বলতে ও বলল, আমি অতশত জানি না। যেটুকু ওই বিষয়ক শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝেছি সেটা হল

এই বিষয়টা সাধারণ মনস্তত্ত্বর বিষয় নয়, এটা প্যারাসাইকোলজির অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ বিয়ন্ড সাইকোলজি এটাকে ওঁরা বলছেন ইনটিউশন বা সঞ্জত হওয়ার শক্তি।

সমরেশ বলল এটা প্যারাসাইকোলজি-র বিষয়। এইজন্য ভাবছি আমার পরিচিত কয়েকজন সাইকোলজির প্রফেসরের সঙ্গে কথা বলবো এবং প্যারাসাইকোলজির বইও সংগ্রহ করবো।

তারপর কয়েকদিন কেটে গেছে। আমার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদেরও এই বিষয়ে খোঁজখবর নিতে বলেছি। সৌভাগ্যক্রমে বাড়ির কাছেই একজনের খবর পেলাম, তিনি একজন গুপ্তযোগী। খুব প্রচারবিমুখ। আমার বন্ধুটির সম্পর্কে জেঠু হন। আমি খুব করে ধরাতে উনি কথা বলতে রাজি হয়েছেন। পরের দিনই বন্ধুটির সঙ্গে ওঁর কাছে গেলাম, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করাতে উনি একদম নতুন কথা বললেন। উনি বললেন, এটা একটা সাইকিক এবিলিটি এবং প্রত্যেক মানুষের ভিতরই কমবেশি এই ক্ষমতা আছে। কতকগুলি নির্দিষ্ট অভ্যাসের দ্বারা এটা বাড়ানোও যায়। যেমন ধরো, তুমি একটা কাজ করতে যাচ্ছ। সেই কাজটির ফলাফল সম্পর্কে যদি আপনা থেকেই কোনো ভাবনা উৎপন্ন হয়, দেখা যায় কাজটির ফলাফল, যা মনে এসেছে সেটাই হয়েছে। আপনা থেকেই যেটা মনে আসে সেটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থেকে আসে। কিন্তু যদি ফলাফল জানার চেষ্টা করো তাহলে সেটা হবে মাইন্ড প্রোজেকশন এবং সেটা ঠিক হতেও পারে আবার ভুলও হতে পারে। কারণ, আমাদের মন কাজ করে পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুযায়ী অর্থাৎ কারো যদি পূর্বে বিভিন্ন কাজে অকৃতকার্য হওয়ার অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে যেকোনো নতুন কাজ করার আগে ভাববে এবারো এই কাজটা হবে না। কোনটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় থেকে আসছে আর কোনটা মন থেকে আসছে এটা অভ্যাস করতে করতে নিজে থেকেই বুঝতে পারা যাবে।

ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাধনাও অধ্যাত্ম সাধনারই অঙ্গ। অধ্যাত্ম সাধনা করতে গেলে প্রথমে দেহকে শুদ্ধ করতে হবে। দেহ শুদ্ধ করার অর্থ হলো, দেহে কোনো টক্সিন থাকবে না। তোমরা ভাব যে নেশাবস্তু খাওয়া ত্যাগ করলেই বুঝি আস্তে আস্তে দেহ থেকে টক্সিন সব দূর হয়ে যাবে। এটা আংশিক সত্যি। প্রধান টক্সিন হল বিভিন্ন মনের অভিব্যক্তি থেকে স্মৃতিতে যেসব সংস্কার থেকে যায়, সেগুলি শুধু মনকেই কলুষিত করে না; স্থূল দেহের মেরুদণ্ডে বিভিন্ন চক্রে এগুলি ব্লক তৈরি করে। যার ফলে শক্তির উত্থানে সমস্যা হয়। যার দেহে যত আলস্য, সে তত অশুদ্ধ দেহের অধিকারী। দেহ থেকে টক্সিন গেলেই দেহ চনমনে হবে।

আমরা যখন সকালে ঘুম থেকে উঠি তখন দেহ আলস্য ভরা থাকে, মানে টক্সিন ভর্তি থাকে। এইজন্য ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্য করে, সামান্য কিছু খেয়ে প্রত্যেকের অন্তত আধঘণ্টা দ্রুত হাঁটা উচিত। তারপর কিছুক্ষণ কপালভাতি প্রাণায়াম ও নাড়িশুদ্ধি করা উচিত। নাড়িশুদ্ধি সম্বন্ধে আরো কিছু কথা পরে বলছি। এগুলি করলে শরীরের টক্সিন অনেকটাই চলে যায়। যাদের রক্তচাপ বেশির দিকে, তারা দ্রুত বা বেশিক্ষণ কপালভাতি করবে না, তাতে ক্ষতি হতে পারে। কিন্তু নাড়িশুদ্ধি সবারই করা উচিত। কারণ আমাদের শরীর ও মনের বেশিরভাগ রোগের কারণ দেহের বাম ও ডানদিকের ভারসাম্য না থাকা। নাড়িশুদ্ধি করলে আমাদের দেহে যে নাড়ি আছে তাদের প্রত্যেকটাতে প্রাণশক্তি চলমান হয়, যার ফলে দেহে ও মনে একটা স্ফূর্তি থাকে। এরপর বললেন, যদি ঠিকভাবে যোগসাধনা করতে হয়, তবে পতঞ্জলির অষ্টাঙ্গ যোগসাধনা করতে হবে।

অষ্টাঙ্গ যোগের পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে এগুতো হয়, কারণ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারটা প্রধানত আজ্ঞাচক্র বা তৃতীয় নয়নের কার্যকারিতার সঙ্গে যুক্ত। বিজ্ঞানীরা আজ্ঞাচক্রকে মস্তিষ্কের ঠিক কেন্দ্রে অবস্থিত পিনিয়াল গ্ল্যান্ড বলছেন। কিন্তু যোগীরা বলছেন, সবার আজ্ঞাচক্র মস্তিষ্কের একই জায়গায় অবস্থান করে না। একটু উপরে বা নিচে থাকে। যেসব মানুষের পূর্ব পূর্ব জন্মে সাধনার ফল থাকে তাদের ভ্রুযুগলের কাছাকাছি থাকে। অন্যদের ক্ষেত্রে একটু উঠে থাকে। যাই হোক, দেহ ও মন প্রস্তুত হওয়ার আগেই যদি আজ্ঞাচক্র জেগে যায় তবে সেই ব্যক্তি একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে গিয়ে পড়েন। এমনকি শক্তিকে সামলাতে না পেরে মস্তিষ্ক বিকৃতিও হতে পারে। এজন্য একজন সমর্থ যোগীগুরুর তত্ত্বাবধানে এগুলি অভ্যাস করা উচিত। এখন অষ্টাঙ্গ যোগ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলছি; আটটি অঙ্গ হচ্ছে– যম, নিয়ম, আসন (মুদ্রা-বন্ধ-বেধ সহ্য, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান সমাধি)।

**যম :** অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। এই পাঁচটি অঙ্গই সাধককে সংযম শিক্ষা দেয়। সংযম মানে কিছুকে হত্যা বা নষ্ট করা নয়। অহিংসা, সত্য, অস্তেয় নীতিশিক্ষার মধ্যে পড়ে, এই পর্যায়ে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্রহ্মচর্য, মহাযোগী, পরমবৈষ্ণব শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভু বলছেন, কলিযুগে কেবলমাত্র ব্রহ্মচর্য ও সত্যরক্ষা করলেই ধর্ম লাভ হতে পারে। ব্রহ্মচর্য শব্দের প্রকৃত অর্থ ব্রহ্মে রত থাকা। অর্থাৎ জগতের প্রতিটি বস্তুকে জড় হিসাবে না দেখে ব্রহ্মের বিকাশ হিসাবে দেখা। শুধু শুক্রধারণই ব্রহ্মচর্য নয়।

**নিয়ম :** শৌচ, সন্তোষ, তপ, সাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান এই পাঁচটির মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ঈশ্বর-প্রণিধান, কিন্তু যাঁরা ষষ্ঠান্দ্রিয়ের জন্য চেষ্টা করছেন, তাঁরা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থেকে রোজ নিয়ম করে আসনে বসা অভ্যাস করলেই হবে। অভ্যাস বলতে, যে কোনো ধ্যানাসনে শিরদাঁড়া সোজা করে বসে শ্বাসের আসা-যাওয়া দেখলেই হবে।

তোমরা জানবে এই যম ও নিয়ম দু'টোই নীতিসাধনা ও সংযম সাধনার অন্তর্গত। যেকোনো উচ্চ অবস্থায় বা সূক্ষ্ম অনুভূতি পেতে গেলে এই দু'টির ভীষণ দরকার। অসংযমী মানুষ কোনো সূক্ষ্ম অনুভূতি গ্রহণ করতে পারে না।

**আসন :** প্রত্যেক মানবদেহে মেরুদণ্ড বরাবর মাথা পর্যন্ত যে ষঠিচক্র আছে, প্রধান স্নায়ুকেন্দ্রগুলি ওই চক্রগুলির সঙ্গে যুক্ত আছে। এই চক্রগুলির আবার সাবসেন্টার বা উপগ্রন্থি আছে। এই সাব সেন্টারগুলি মনের বিভিন্ন ভাবনা-চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রত্যেকটা আসন এই গ্রন্থি (chakras) ও উপগ্রন্থির ওপর চাপ সৃষ্টি করে অথবা চাপ বিমোচন করে। যেমন ময়ূরাসন। এই আসনটি অভ্যাস করলে দেহের তৃতীয় চক্র অর্থাৎ মণিপুর চক্রের গ্রন্থি ও উপগ্রন্থির

ওপর চাপ সৃষ্টি করে এবং গ্রন্থিগুলি থেকে যে রস ক্ষরণ হয় তাকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই মণিপুর চক্রের উপগ্রন্থিগুলির মানসিক বৃত্তির ভেতর 'ভয়' একটা বৃত্তি, অর্থাৎ মণিপুর চক্র ঠিকভাবে কাজ করলে তার মন থেকে 'ভয়' অনেকাংশে নিবারিত হয়। মনের বিভিন্ন বৃত্তিগুলি যা মনকে চঞ্চল করে তাদের নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য আসন অভ্যাস একান্ত প্রয়োজন।

কতকগুলি ধ্যানাসন একটানা অন্তত আধঘন্টা বসা অভ্যাস করলেই হবে। যেমন, পদ্মাসন, সিদ্ধাসন ইত্যাদি। যদি তাও না পারো, তবে হাঁটু মুড়ে শিরদাঁড়া সোজা করে সুখাসনে বসলেও হবে। এর সঙ্গে দু'টি একটি বন্ধ অভ্যাস করতে হয়। যেমন মুখবন্ধ, মহাবন্ধ ইত্যাদি মুদ্রা।

**প্রাণায়াম :** মনের একাগ্রতা বা ভাবগ্রহণী শক্তি বাড়াবার জন্য প্রাণায়াম খুব উপযোগী। প্রাণায়াম সাধনার দ্বারা মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ আসে। কারণ প্রাণায়াম করলে শ্বাস ছন্দোবদ্ধ হয়। শ্বাসের সঙ্গে মনের যোগ খুব নিবিড়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায়, যখন কোনো ব্যক্তি রেগে যান, তখন দেখা যায় তাঁর শ্বাস খুব জোরে জোরে পড়ছে। রাগ তো মনেরই একটা বৃত্তি। এই প্রাণায়ামের তিনটি অঙ্গ, তোমরা জানো বলেই মনে হয়। পূরক, কুম্ভক, রেচক। কুম্ভক সহিত প্রাণায়াম করতে বলছি না। একটা খুব সহজ পদ্ধতি শেখাচ্ছি, যেটা সারাদিন যখনই সময় পাবে করবে। এই পদ্ধতিতে মন খুব সহজেই শান্ত ও একাগ্র হয়। পদ্ধতিটি হচ্ছে যদি ৪ গুণে শ্বাস গ্রহণ কর, তবে অন্তত ৬ গুণে শ্বাস ছাড়বে। শ্বাস নেয়া বা ছাড়াটা ডিপ এবং ইউনিফর্ম হবে। এইরকম ১০ মি. সকালে ও ১০ মি. সন্ধ্যায় অভ্যাস করলেই মনে একটা অদ্ভুত শান্তি আসতে থাকবে।

**প্রত্যাহার :** অধ্যাত্ম সাধনার ক্ষেত্রে প্রত্যাহার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। প্রত্যাহার মানে মনকে বাইরের বস্তু থেকে তুলে নেয়া। কারণ মন সবসময় সুখ পাওয়ার জন্য বাইরের বস্তুর দিকে ছুটছে। সেখান থেকে মনকে তুলে নিয়ে শরীরের ভেতরে কোনো বিন্দুর দিকে চালিত করা অর্থাৎ ধারণা করা। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তৃতীয় নয়নের উন্মোচনের একটা যোগ আছে। সেটা ধ্যানের দ্বারা সম্ভব। এছাড়া অষ্টাঙ্গ যোগের পরের তিনটি বিষয় ধারণা, ধ্যান, সামধি। এর ভেতর আমরা শুধু ধ্যানের অংশটাই নেবো। কারণ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় সক্ষমের সাধনায় বাকি তিনটি চরণের অত গভীরে যাওয়ার দরকার নেই। ওইগুলি যারা গভীর অধ্যাত্মসাধনায় রত অর্থাৎ যাদের লক্ষ্য 'সমাধি' তারা গভীরে যাবে। ❑

# বিজ্ঞানীদের মজার কথা : ভুলো মনের আইনস্টাইন

মৃণাল শীল

বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, যাঁর নাম শুনলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিখ্যাত সমীকরণ $E=mc^2$। এই সমীকরণটিই বিশ্বের সামনে তুলে ধরেছিল ভর ও শক্তির সম্পর্ককে। বলা যায় এটিই হল পরমাণু শক্তি উৎপাদনের ভিত্তি।

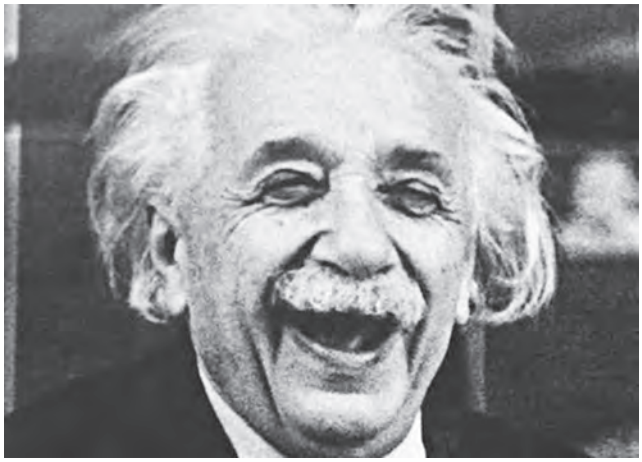

গুরু-তত্ত্বের আবিষ্কর্তা হলেও এই বিশ্ববিখ্যাত মানুষটি মোটেই ভীষণ গম্ভীর বা রসবোধহীন ছিলেন না। তাঁর জীবনের বেশ কিছু ঘটনা থেকে মানুষ আইনস্টাইনের পরিচয় পাওয়া যায়। শোনা যায়, বারো বছর বয়স পর্যন্ত আইনস্টাইন খুব মসৃণভাবে কথা বলতে পারতেন না। স্কুলের ক্লাসে অন্য সতীর্থদের বিরক্ত করা আর দুষ্টু স্বভাবের জন্য তাঁকে সবাই ডাকতো 'রটারডাম রটার' বলে। তবে, তাঁর ক্লেপটোম্যানিয়া নামে একটি অসুখ ছিল। যে কারণে ছোটবেলায় আইনস্টাইন অজ্ঞানতাবশত প্রায়ই অন্যদের জিনিস চুরি করে ফেলতেন। অবশ্য পরবর্তীকালে তিনি এই রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।

যাই হোক আইনস্টাইন একদিন আমেরিকার প্রিন্সটন থেকে ট্রেনে উঠেছেন, যে সময় বিজ্ঞানী হিসেবে তিনি খ্যাতির শীর্ষে। টিকিট পরীক্ষক যথারীতি আইনস্টাইনের কাছে এসে টিকিট চাইলেন। আইনস্টাইনও তাঁর কোটের পকেটে হাত দিয়ে টিকিট বের করতে গিয়ে দেখলেন টিকিটটা নেই। কোথায় গেল টিকিট! তিনি তাঁর প্যান্টের পকেট, জামার পকেট এমনকি ব্রিফকেস্ তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন কিন্তু কোথাও টিকিটের দেখা নেই। আইনস্টাইনের অবস্থা দেখে সেই টিকিট পরীক্ষক তাঁকে বললেন, 'স্যার আমি জানি আপনি কে। শুধু তাই নয়, ট্রেনে উপস্থিত অন্যান্যরাও আপনাকে চেনেন। আপনি ট্রেনে টিকিট না কেটে উঠবেন, এটা হতেই পারে না।' এই বলে টিকিট পরীক্ষক অন্য যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

এর কিছুক্ষণ পর সেই টিকিট পরীক্ষক খেয়াল করলেন যে আইনস্টাইন তখনও টিকিট খুঁজে চলেছেন, ট্রেনের মধ্যে হাঁটু মুড়ে বসে সিটের তলা পর্যন্ত হাতড়াচ্ছেন। টিকিট পরীক্ষক তখন আইনস্টাইনকে বললেন, 'স্যার আমি তো আপনাকে বললাম, আপনার টিকিট দেখানোর কোনও প্রয়োজন নেই, আপনি কেন শুধু শুধু ওটাকে খুঁজছেন।' উত্তরে আইনস্টাইন বলেন 'আসলে আমি কোথায় যাব সেটাই ভুলে গিয়েছি, তাই টিকিটটা না খুঁজে পেলে সেটা কিছুতেই মনে করা সম্ভব নয়।'

আইনস্টাইনকে জীবনে বহু বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তাঁর আবিষ্কার সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে হয়েছে। এই সব দিনগুলিতে তাঁর সঙ্গী হিসেবে থাকতেন তাঁর এক গাড়ির চালক হ্যারি। হ্যারি, আইনস্টাইনের বক্তৃতার সময় পিছনের সারিতে বসে থাকতেন আর সবটা শুনতেন। একদিন হ্যারি আইনস্টাইনকে বলেন 'প্রফেসর, আপনি আপনার ওই আপেক্ষিকতাবাদ তত্ত্বের ওপর বক্তৃতাটা এতবার দিয়েছেন যে, আমার তো দাঁড়ি, কমা সুদ্ধ মুখস্থ হয়ে গিয়েছে।' শুনে আইনস্টাইন বলেন, 'খুব ভালো কথা, আমার পরের সপ্তাহে ডর্টমাউথ যাওয়ার কথা। ওখানে আমাকে আগে কেউ দেখেনি, তুমি সেখানে আইনস্টাইন হয়ে বক্তৃতা দাও আর আমি তোমার জায়গায় ড্রাইভার হয়ে যাব।'

যেমন কথা তেমন কাজ। হ্যারি তো ডর্টমাউথ-এ বক্তৃতা দিল। সবাই হ্যারিকেই আইনস্টাইন ভাবলো। বক্তৃতার শেষে শ্রোতারা কঠিন কঠিন প্রশ্ন করতে লাগলো। বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য হ্যারি বুদ্ধি খাটিয়ে ড্রাইভাররূপী আইনস্টাইনকে দেখিয়ে বললেন, 'আপনাদের প্রশ্নগুলি এতটাই সোজা যে, এর উত্তর আমার ড্রাইভারই দিতে পারবে।' বিজ্ঞানীর মতো তাঁর ড্রাইভারটিও ছিলেন বুদ্ধিমান। ❑

**হ্যারি তো ডর্টমাউথ-এ বক্তৃতা দিল। সবাই হ্যারিকেই আইনস্টাইন ভাবলো। বক্তৃতার শেষে শ্রোতারা কঠিন কঠিন প্রশ্ন করতে লাগলো। বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য হ্যারি বুদ্ধি খাটিয়ে ড্রাইভাররূপী আইনস্টাইনকে দেখিয়ে বললেন, 'আপনাদের প্রশ্নগুলি এতটাই সোজা যে, এর উত্তর আমার ড্রাইভারই দিতে পারবে।'**

বর্তমান পত্রিকা : কলকাতা, রবিবার ১০ মার্চ ২০১৯, ২৫ ফাল্গুন ১৪২৫

# ASHA TRAVELS LTD.

*High Quality Service in Town Since 2001 World Wide Competitive Fare*

IATA

TICO
TRAVEL INDUSTRY COUNCIL OF ONTARIO

সিলেট যাত্রীদের আমরা সরাসরি সিলেটে
পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকি

**2694 Danforth Avenue**
Toronto, ON M4C 1L7
**Tel: 416-693-6917**
**1-866-693-6917**
Fax: 416-693-3178
E-mail: info@ashatravels.ca
Web: www.ashatraveles.ca

শারদীয় শুভেচ্ছা

*Suman Dash*
Manager

আমরা এখন নতুন ঠিকানায়
আপনাদের আরো কাছাকাছি

**OUR SERVICES:**

- AIRLINE TICKETING
- CAR AND HOTEL RESERVATIONS
- TRAVEL INSURANCE
- PASSPORT & VISA INFORMATION

- **Sylhet Office : 0821-718833 / 712760**
- **Dhaka Office : 02-935-6487 / 935-7371**
- **Moulavibazar Office : 0861-52691**
- **Sreemongal Office : 08626-678**

**TICO Reg. # Retail: 50009797**
**Wholesale: 50011294**

AIR CANADA · BRITISH AIRWAYS · KUWAIT AIRWAYS · GULF AIR · SINGAPORE AIRLINES · ETIHAD AIRWAYS · bangladesh · malaysia airlines · AIR INDIA · Emirates · SAUDI ARABIAN AIRLINES · QATAR AIRWAYS · Delta · KLM · UNITED · CATHAY PACIFIC

# রাধাষ্টমী

চিরঞ্জয় চক্রবর্তী

শ্রীরাধিকা বৃন্দাবনে বর্ষণা গ্রামে বৃষভানুর কন্যারূপে জন্ম নিয়েছিলেন। জন্মতিথিটা ছিলো ভাদ্রমাসের শুক্লা অষ্টমী। বর্ষণা গ্রামের অবস্থান খুব সুন্দর, গোবর্ধন আর নন্দগাঁও-এর মাঝে। গ্রামের চারিদিকে সবুজ কৃষি জমি, চোখ জুড়ানো সেই সবুজ জমি পার করলেই ঘন জঙ্গল। জঙ্গলে অন্যান্য প্রাণী ছাড়াও প্রচুর বাঁদর আর ময়ূর ছিলো। ময়ূরগুলো প্রায়শই জঙ্গল থেকে লোকালয়ে এসে বিভিন্ন বাড়ির চালে উঠোনে বা ফাঁকা জায়গায় নাচ করতো। গ্রামের মানুষ খুব সুন্দর সেইসব দৃশ্য উপভোগ করতো। শ্রীরাধিকাও ময়ূরের নাচ দেখতেন, বাহারী পেখম তুলে যখন ময়ূরগুলো নাচতো, সবাই ভুলে যেতো তারা কী করছিলো। সূর্যের আলোয় সেই পেখম থেকে এমন ছ'টা বেরুতো, সবাই তাতেই মোহিতো হয়ে যেতো। শ্রীরাধিকাও এই অপরূপ প্রকৃতির মধ্যে বড় হয়েছেন। বনের বাঁদরগুলোও গ্রামে ঢুকে পড়তো। বাঁদাগুলো গ্রামের মধ্যে ঢুকে খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও নানাবিধ জিনিসপত্র নিয়ে যেতো। এই অঞ্চলের ব্রজবাসীরা নরম মনের বলে সবাই জানে। গ্রামবাসীরা কখনো রাগ করতো না বা মারতো না। তারা বাঁদরদের তাড়িয়ে দিতো। গ্রামের চারিদিকে বেশ কয়েকটি ঝর্ণা ও বড় পুকুর ছিলো, ফলের সবুজের মাঝে জলের ধারা বেশ মনোরম পরিবেশ তৈরি হতো। কবির ভাষায় মৃদুমন্দ মলয় বাতাসে শরীর মন জুড়িয়ে যেতো। সবাই মনে করে যেন রাধা-কৃষ্ণের মিলনের জন্যেই জগতের এই গ্রাম অপরূপ তৈরি হয়েছিল।

**কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী থেকেও রাধাষ্টমী অনেক জাঁকজমক সহকারে হয়। মানুষ রাধা নামে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। উত্তর-ভারতের একটা বড় অংশের মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে দেখা হলে বলে, 'জয় রাধে।' সারা ভারতের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষের একটাই প্রথম বাক্য 'জয় রাধে'।**

কৃষ্ণের জন্মতিথির পনেরো দিন পরেই রাধাষ্টমী হয়। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিপুল উদ্দীপনায় মানুষ রাধাষ্টমী পালন করে। কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী থেকেও রাধাষ্টমী অনেক জাঁকজমক সহকারে হয়। মানুষ রাধা নামে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। উত্তর-ভারতের একটা বড় অংশের মানুষ অন্য মানুষের সঙ্গে দেখা হলে বলে, 'জয় রাধে।' সারা ভারতের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষের একটাই প্রথম বাক্য 'জয় রাধে'। এর কারণ কী? রাধা এইভাবে পূজিতা হন কেন? এই প্রশ্ন শুধু সাধারণ মানুষের নয়। বিষয়টা নিয়ে ভেবেছিলেন স্বয়ং নারদ নিজেও। তিনি কৌতূহলবশত শ্রীরাধিকার উপাসনা বিধি সম্বন্ধে জানতে উদগ্রীব হয়েছিলেন। তাই নারায়ণকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, শ্রীরাধিকা মর্ত্যমণ্ডলে পূজিতা হন কোন পদ্ধতিতে? বেদেও যে কথা গোপন রয়েছে, সেটা আমি জানতে চাই। শুনে নারায়ণ হেসে বলেছিলেন, বলতে পারি কিন্তু কাউকে বলবে না। কারণ এখনও কাউকে বলিনি, তুমিই প্রথম শুনবে শ্রীরাধিকা উপাসনার কথা। নারদ জিজ্ঞাসা করলেন, শ্রীরাধিকা কে?

"শূল প্রকৃতিরূপিণী চিন্ময়ী ভুবনেশ্বরী থেকে জগতের উৎপত্তিকালে, প্রাণ ও বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুই শক্তি আবির্ভূতা হন। তার মধ্যে প্রাণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা রাধা-শক্তি আর বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দুর্গাশক্তি। এই বিশাল জগৎ এই শক্তিযুগলের অধীন। এদের দু'জনের অনুগ্রহ ছাড়া মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। সেই কারণে তাঁদের অনুগ্রহ লাভের জন্য প্রতিদিন সেই শক্তি যুগলের আরাধনা করা কর্তব্য। হে নারদ। সেই দুই শক্তির মধ্যে প্রথমে শ্রীরাধিকাশক্তির মন্ত্র বলছি, মন দিয়ে শোনো, যে মন্ত্র ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও অন্যান্য দেবতারা প্রতিনিয়ত জপ করে চলেছেন। ছয় অক্ষরের সেই মন্ত্র 'শ্রী রাধায়ৈ স্বাহা'; এই ছয় অক্ষরের মহামন্ত্র জপ করলে ধর্মলাভ হয়।"

নারায়ণ আরও বলেছিলেন, "এই মন্ত্রের মহিমা সহস্রকোটি মুখে, শতকোটি জিভেও বর্ণনা করা যায় না। প্রথমে গোলোকধামে রাসমণ্ডলে শ্রীকৃষ্ণ মূলপ্রকৃতি-দেবীর উপদেশে এই মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে বিষ্ণুর উপদেশে ব্রহ্মা, ব্রহ্মার উপদেশে ধর্ম এবং ধর্মের উপদেশে আমি এই মন্ত্র গ্রহণ করি। আমি এই মন্ত্র জপ করে ঋষিনামে অভিহিত হয়েছি। ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলেই পরমানন্দে নিয়ত সেই রাধাশক্তির ধ্যান করে থাকেন। শ্রীরাধিকার পুজো ছাড়া কৃষ্ণের পুজোর অধিকার হয় না। সব বৈষ্ণবেরই রাধার পুজো করা অবশ্য কর্তব্য। রাধা-কৃষ্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; কৃষ্ণ রাধার অধীন। রাধা সবসময়ে কৃষ্ণের রাসেশ্বরী হয়েছেন। কৃষ্ণও এক মুহূর্তের জন্যও রাধাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। এই শক্তিদেবী সমস্ত কামনা রাধন–অর্থাৎ সাধন করেন বলে রাধা নামে বিখ্যাত হয়েছেন। হে মুনিবর! সামবেদের নিয়ম অনুসারে সবসময়ে রাসনায়িকা মহাদেবী রাধিকার ধ্যান করবে। যেমন– কৃষ্ণের প্রাণাধিকা পরমেশ্বরী রাধিকা, তিনি গোপীগণের নায়িকা, রাসমণ্ডলের মধ্যে রত্নসিংহাসনে বসে আছেন। তাঁর গায়ের রঙ সাদা চাঁপাফুলের মতো, মুখটা যেন শরৎকালের চাঁদ আর চোখ দু'টো যেন শরৎকালের পদ্ম, দাঁত কুন্দফুলের মতো সুন্দর এবং সাজানো, তিনি এতটাই সুশোভনা যে তাঁর রূপের কাছে কোটি চন্দ্রের ছ'টাও মলিন হয়ে যায়। তিনি সালঙ্কারা এবং ক্ষৌমবস্ত্র পরিধান করে থাকেন। তাঁর একহাতে অগুয় মুদ্রা অন্যহাতে বর

মুদ্রা। তিনি ভক্তদের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য সর্বদা ব্যস্ত। তিনি স্থির যৌবনা, দেখতে সবসময়ে বারো বছরে স্ত্রী।

এইভাবে দেবী রাধিকার ধ্যান করে– শালগ্রামে, ঘটে, যন্ত্রে অথবা অষ্টদল পদ্মে আবাহন জানিয়ে যথাবিহিত পূজা করবে। যে মানুষ এইভাবে রাসেশ্বরী পরমাদেবী রাধার পুজো করবে, সে বিষ্ণুতুল্য হয়ে নিশ্চই গোলোকধামে যাবে। যে জ্ঞানী মানুষ ভাদ্রমাসে শুক্লা অষ্টমীতে রাধা-জন্মোৎসব করে, রাসেশ্বরী রাধা তাকে সান্নিধ্য দেন। অর্থাৎ দর্শন দেন।"

এতটা বৃত্তান্ত শুনে নারদ বললেন, যা পাঠ করলে দেবী প্রসন্না হন, সেইরকম কিছু স্তোত্র আমাকে বলুন। তখন নারায়ণ বললেন, "হে রাসমণ্ডলবাসিনী পরমেশ্বরী। আপনি কৃষ্ণের প্রাণাধিক প্রিয় এবং রাসেশ্বরী। আপনাকে নমস্কার করি। হে ত্রৈলোক্য জননী। আপনি দয়াসাগররূপা! ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া থাকেন, আপনাকে নমস্কার করি। হে দেবী! আপনি সরস্বতী, সাবিত্রী, গঙ্গা, পরাবতী, ষষ্ঠী ও মঙ্গলচণ্ডিরূপী এবং সকলের কল্যাণকারিণী– আপনাকে নমস্কার। হে ভগবতী। আপনি তুলসী, লক্ষ্মী, মনসা ও দুর্গারূপিণী, অধিক কি আপনি সর্বরূপিণী, আপনাকে বারবার নমস্কার করি। হে দেবী! আপনি দয়া করে আমাদের সংসার সাগর থেকে উদ্ধার করুন।"

নারায়ণকে প্রণাম করে নারদ বৃন্দাবনে এলেন। দেখবেন ব্রজমণ্ডলে তিনি কীভাবে পূজিতা হন। যমুনার ধারে যতগুলি আশ্রম আছে, তার মধ্যে অনেকেই টাটিয়া স্থানে এসে ওঠে। সাধু ও সাধারণ মানুষ সবাই এই আশ্রম পছন্দ করে। তার কারণ অনেক পুরোনো গাছ ও লতার কুঞ্জে ঘেরা আশ্রমটি। ভেতরে উঠোনে বালি সুন্দর করে রাখা হয়েছে, কোথাও বাঁধানো চত্বর নেই। আশ্রমটির বাসিন্দারা অত্যন্ত কঠোরী মহাত্মা। সকলেই ব্রহ্মচারী, সামান্য বহির্বাস পরনে, সারা মুখে মাটি মাখা বৈরাগী সাধু। বিখ্যাত বৈষ্ণব সাধু হরিদাস স্বামীর ত্যাগী শিষ্য-সম্প্রদায়ের মূল আস্তানা এটি। এখানে হরিদাস স্বামীর ব্যবহৃত একটা অতি জীর্ণ কাঁথা, তাঁর করঙ্গ (ভিক্ষাপাত্র) ও সাপের মতো বাঁকানো একটি গাছের ডালের লাঠি এখনো পরম শ্রদ্ধার সঙ্গে রাখা আছে। প্রতিবছর রাধাষ্টমীর দিন সেগুলো সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য বাইরে রাখা হয়। ওই দিন আশ্রমে বিরাট উৎসব হয়। উৎসবের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেদিন কচুর তরকারি, কচুসেদ্ধর ভোগ হয়। অবশ্য তার সঙ্গে আরও নানা উপচারও থাকে, যেমন খিচুড়ি, পোলাও, পরমান্ন, ভাত ও নানাবিধ ব্যঞ্জন। কিন্তু কচুই প্রাধান্য পায় তাতে। মহাবৈরাগী হরিদাস স্বামী ছিলেন সঙ্গীতসাধক তানসেনের গুরু। তিনি এইসব বন্য খাবার খেয়ে শরীর ধারণ করতেন। তাঁর স্মৃতিতে এই ব্যবস্থা।

রাধাষ্টমীর দিন সকালে উঠে ভক্তরা সারাদিন শ্রীমতী রাধারানীর পুজো করে, সঙ্গে অবশ্যই কৃষ্ণের পুজোও হয়। কেউ কেউ উপোস করে। সারাদিন পুজোপাঠ ও ভজন-কীর্তন হয়। লোকে বলে শ্রীমতী রাধারানীর পূজার্চনা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা হয় না। দুপুরে পঞ্চামৃত দিয়ে শ্রীমতী রাধারানিকে স্নান করানো হয়, তারপর নতুন বস্ত্র ও নানাবিধ সুগন্ধি দ্বারা তাঁকে সাজানো হয়। ফুলমালাও বাদ যায় না। বর্ষণায় যে রাধাকুণ্ড আছে, সেখানে সারাবছর কেউ স্নান করতে পারে না। যতই মুখে জয় রাধে, জয় রাধে করুক। রাধাষ্টমীর দিন মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। ওই সময় স্নান করা যায়। রাধাকুণ্ডে স্নান করে মানুষ শ্রীমতী রাধারানীর কৃপা পায়। স্নান সেরে সবাই বলে 'জয় রাধে।' ❑

**প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।**
**অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধঃ, ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥** (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ৬/৪৫)

**অনুবাদ :** সে যোগী ইহজন্মে পূর্ব জন্মকৃত যত্ন অপেক্ষা অধিকতর যত্ন করেন এবং ক্রমে যোগাভ্যাস দ্বারা পাপ মুক্ত হয়ে বহু জন্মের চেষ্টায় সিদ্ধি লাভ করে পরম গতি লাভ করেন।

**তপস্বিভ্যো অধিকো যোগী, জ্ঞানিভ্যো অপি মতো অধিকঃ।**
**কর্মিভ্যশ্'চাধিকো যোগী, তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥** (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা ৬/৪৬)

**অনুবাদ :** সে যোগী তপস্বীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এবং সকাম কর্মীদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। ইহাই আমার অভিমত। অতএব, হে অর্জুন! তুমি যোগী হও।

# সারদা টেইলার্স এন্ড অল্টারেশন
# Sarada Tailors & Alteration

**Your Best Option For Fashion & Imitation Jewellery**

এখানে

- সুদক্ষ পুরুষ ও মহিলা কারিগর দ্বারা আপনার আধুনিক রুচিসম্মত পোষাক তৈরী করা হয়, মডার্ণ ডিজাইনের ব্লাউজ, ব্রাকাট ব্লাউজ, পেটিকোট, Unstitched থ্রি পিছ, শাড়ীর ফলস, পিকো, বাচ্চাদের ড্রেস, হিজাব ও বোরকাসহ সমগ্র অল্টারেশনের কাজ মানসম্মত ভাবে করা হয়।
- এছাড়া ব্লাউজের নিত্য নতুন লটকন (Latkan) সহ সেলাই কাজের যাবতীয় মালামাল সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

শারদীয় শুভেচ্ছা

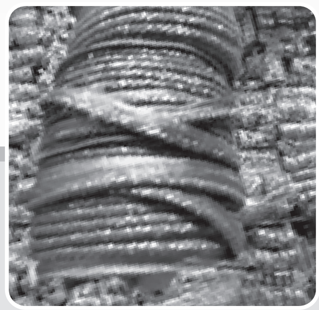

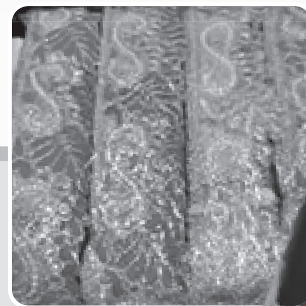

**Contact:**
**Mukta Roy**
**Cell:**
**647-632-9724**

2972 Danforth Avenue (1st Floor)
Toronto, ON, M4C-1M6
Tel: 416-686-2448 (Office)
Email: nickmukta@gmail.com
www.saradafashion.com

# কোম্পানির আমলে সাহেবদের দুর্গোৎসব

**অরিন্দম ঘোষাল**

‘এবার পূজার সময় লর্ড ক্লাইভ আমার বাড়িতে অনুগ্রহপূর্বক প্রতিমা দর্শন করিতে আসিবেন। তাঁহার সহিত কোম্পানির বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকিবেন। তোমার আসা চাই’–

শোভাবাজার রাজবাড়ির রাজা নবকৃষ্ণদেব মহাশয় বন্ধুকে চিঠিতে লিখছেন। হ্যাঁ, ১৭৫৭ সালে রাজা নবকৃষ্ণদেব বসন্তকালীন দুর্গাপূজা শরৎকালে তাঁর শোভাবাজার রাজবাড়িতে প্রথম শুরু করেন। তবে এর পিছনে ছোট্ট ইতিহাসটা বলা দরকার।

১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি লর্ড ক্লাইভের হাতে বাংলার নবাব সিরাউদ্দৌলা পরাজিত হন। সেই পরাজয়ে অন্যতম উল্লসিত ব্যক্তিরা হলেন নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও কলকাতার রাজা নবকৃষ্ণদেব। ক্লাইভের পরামর্শে তাঁরা পলাশির যুদ্ধের বিজয় উৎসব করেন দুর্গোৎসবের মধ্য দিয়ে। আর তাতে তাঁরা প্রচুর অর্থ খরচ করেন। এরপর থেকে প্রতিবছর শরৎকালে দুর্গাপূজা করে, তাঁরা পলাশীর যুদ্ধের স্মারক উৎসব পালন করতেন। আরও মজার ব্যাপার হলো, তাঁদের দেখাদেখি অন্যান্য হিন্দু জমিদার বা ব্যবসায়ীরাও শরৎকালে দুর্গোৎসব পালন করতে থাকেন।

> **সেকালে পুজোর নিমন্ত্রণের ত্রুটি ঘটতো না। কার্ডের ব্যবস্থা ছিলো। জানা গেছে, বাবুদের সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ বা ব্যবসায়িক যোগাযোগ নেই তাঁদেরও পুজোতে আমন্ত্রণের জন্য চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন দেয়া হতো। আসলে পুজোটি বাবুদের নামে হলেও দুর্গোৎসবটা ছিলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহেবদের পুজো।**

অবাক করা কথা হলো, ক্লাইভ নিজে খ্রিষ্টান এবং মূর্তিপূজার বিরোধী হয়েও ১৭৫৭ সালে নবকৃষ্ণের নবনির্মিত ঠাকুরবাড়ির দুর্গাপুজোয় একশো এক টাকা দক্ষিণা আর ঝুড়ি-ঝুড়ি ফলমূল পাঠিয়েছিলেন। শুধু কি তাই? সেবার নবকৃষ্ণের বাড়িতে ক্লাইভের জন্য বাইজি নাচের ও মদ-মাংসের ব্যবস্থা করা হয়েছিলো আর প্রথম শরৎকালে এই দুর্গার মূর্তিপূজা ক্লাইভের পূজাতেই পরিণত হয়েছিলো। তবে প্রসঙ্গেক্রমে বলি, শরৎকালে দুর্গাপূজার ব্যাপারে পুরাণ বা রামায়ণের পূজা ব্যতিরেকেই এই আলোচনা। এই দুর্গাপূজার পর পরবর্তীকালে কলকাতার বাবুদের দুর্গাপূজাতে সাহেবদের উত্তরোত্তর ভিড় বেড়েছিলো।

সেকালে পুজোর নিমন্ত্রণের ত্রুটি ঘটতো না। কার্ডের ব্যবস্থা ছিলো। জানা গেছে, বাবুদের সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ বা ব্যবসায়িক যোগাযোগ নেই তাঁদেরও পুজোতে আমন্ত্রণের জন্য চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন দেয়া হতো। আসলে পুজোটি বাবুদের নামে হলেও দুর্গোৎসবটা ছিলো ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাহেবদের পুজো। ১৭৬৬ সালে হলওয়েল সাহেবের লেখা Interesting Historical Event বইতে পাই– দুর্গাপূজা জেন্টুদের বা বাবুদের সবচেয়ে গ্র্যান্ড বা জমকালো উৎসব। সাধারণত সাহেবরাও এই উৎসবে যোগদান করার জন্য আমন্ত্রিত হন।

আবার কোম্পানির আরেক সাহেব দুর্গাপূজা করতেন নিজের টাকায়। অবাক করা কথা হলেও সত্য হান্টারের ‘Annals of Rural Bengal’-এর বিখ্যাত ম্যানুফ্যাকচারার জন চিপস সাহেব। বীরভূমের জনপ্রিয় ‘শ্রীযুত চিক বাহাদুর’, ১৭৮৭ সালে তিনি কোম্পানির অডিটর জেনালের হয়ে বীরভূমে যান। তিনি থাকতেন শান্তিনিকেতনের কাছাকাছি সুরুলে। আর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অফিস ছিলো সোনামুখীতে। রায়পুরের লর্ড সিংহদেব বংশের শ্যামকিশোর সিংহ ছিলেন চিপসের দেওয়ান। চিপস কোম্পানির পাশাপাশি তিনি নিজেও ব্যবসা শুরু করলেন। কিন্তু ব্যবসা ভালোমতো হচ্ছিলো না। ঝোপ বুঝে শ্যামকিশোর তখন চিপসকে দুর্গাপূজা করার পরামর্শ দিলেন। আর সাহেবেরও দুর্গোৎসব সম্পর্কে ধারণা ছিলো। তিনি শ্যামকিশোরের প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। সুরুলে কোম্পানির দেয়া সাহেবের কুঠিতে ধুমধামে পুজো শুরু হলো। চিপস সাহেবের পুজো বাবদ বছরে খরচ হতো পঞ্চাম টাকা। পুজোর খরচ সতেরো টাকা, বাকি টাকায় গাঁয়ের লোকেরা নতুন কাপড় পেতো। আর মহাষ্টমীর দিন পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া হতো।

কোম্পানির আমলে শেষে দুর্গোৎসব নয়া কলকাতা কালচারের একটা প্রধান অঙ্গ হয়ে উঠেছিলো। ক্লাইভ, হেস্টিংস, হলওয়েল, চিপস প্রমুখ সাহেবের যুগে শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ, আন্দুলের রাজা রামচাঁদ রায়, রাজা গোকুলচন্দ্র ঘোষাল, দ্বারকানাথ ঠাকুর, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ প্রমুখ রাজার দ্বারা বাঙালির সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব গ্র্যান্ড ফিস্ট অব দি জেন্টুস’-এ পরিণত হয়েছিলো।

১৭৯২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর ‘ক্যালকাটা ক্রনিকল’ পত্রিকায় দুর্গোৎসবের বিবরণ প্রসঙ্গে কয়েকটি বিখ্যাত বাড়ির কথা উল্লেখ করা হয়। তাঁদের মধ্যে রাজা নবকৃষ্ণ, কেষ্টচাঁদ মিত্র, নারায়ণ মিত্র, রামহরি ঠাকুর, বারাণসী ঘোষ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর প্রমুখের নাম করে বলা হয়– অন্যান্য বছরের মতো এবছরও কলকাতায় এইসব ধনীগৃহে সাহেবরা প্রমোদ সভায় যোগ দেবেন। উৎসবে সাহেবদের এই মেলামেশা সম্পর্কে পত্রিকায় বলা হয়– Call it diversion, and the pill goes down, আর সেই সময় সাহেবদের দুর্গোৎসবে অংশগ্রহণ করা নিয়ে ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে দুর্গাপূজার প্রতিযোগিতা হয়ে থাকতো।

১৭৯২ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর আবার ‘ক্যালকাটা ক্রনিকল’ পত্রিকায় মহারাজা সুখময় রায়ের বাড়ির নাচ সভার বিবরণ ছিলো– এ বছরের নতুনত্ব হলো হিন্দুস্থানি গানের সঙ্গে ইংরেজি সুর মিলিয়ে পরিবেশন– ‘The Only novelty that rendered the entertainment different from those, of last year was the introduction, or rather the attempt to introduce some English tunes among the Hindoostanee music।’ মহারাজ নবকৃষ্ণের বাড়ির দুর্গোৎসব সম্বন্ধে কেরি সাহেব বলেছেন– The majority of company Crowed to Raja Nabakessen’s where several mimics attempted to